সৃষ্টি

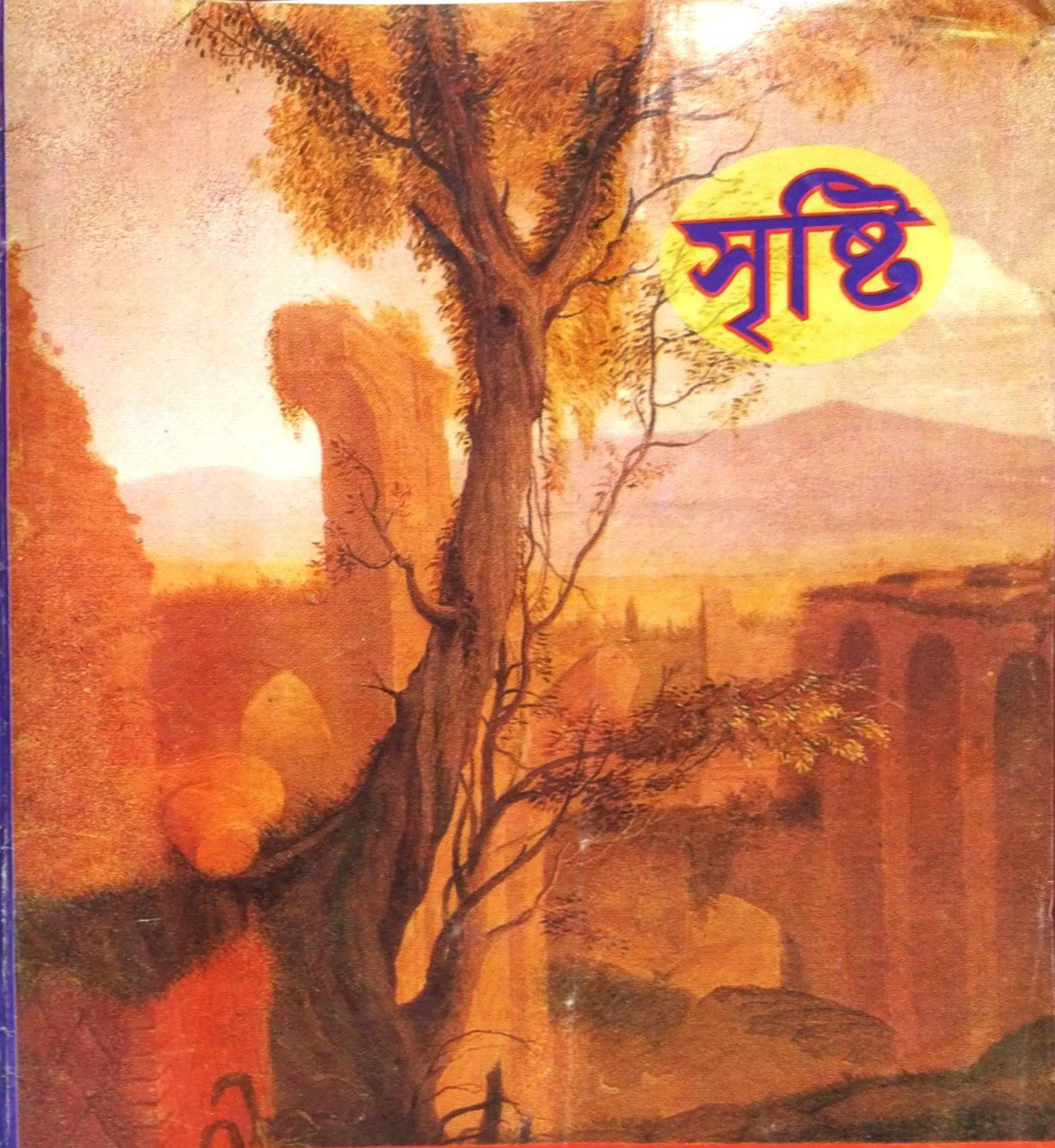

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা ২০০৬-২০০৭

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

BHANGAR MAHAVIDYALAYA
ANNUAL COLLEGE MAGAZINE

সৃষ্টি

SRISTI

রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবা-মাত্র তাহার অর্থ বুঝা যায়, গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।

One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and to yeild.

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪পরগণা

সৃষ্টি

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

SRISTI

**BHANGAR MAHAVIDYALAYA
ANNUAL COLLEGE MAGAZINE**

প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ২০০৬-০৭

সভাপতি ঃ ডঃ প্রদীপ কুমার বসু
অধ্যক্ষ, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ অধ্যাপক ডঃ নিরুপম আচার্য (বাংলা বিভাগ)
অধ্যাপিকা মধুমিতা মজুমদার (ইংরেজী বিভাগ)
অধ্যাপক দশরথ হালদার (বাংলা বিভাগ)
অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্টাচার্য (ইংরেজী বিভাগ)
অধ্যাপিকা ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্ত (শিক্ষা বিভাগ)
সামিম আহমেদ তরফদার (পত্রিকা সম্পাদক)

প্রকাশনা ঃ ভাঙড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মুদ্রক ঃ নিও-প্রিন্ট
২০এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

1. FROM THE PRINCIPAL'S DESK
2. পত্রিকা সম্পাদকের কলম থেকে
3. সাধারণ সম্পাদকের কলম

প্রবন্ধ

4. "পূর্ব ও পশ্চিম—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা — নিরুপম আচার্য (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ) ১১
5. সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ভারত ছাড় আন্দোলনের চরিত্রচিত্রণ — অধ্যাপক অপরূপ চক্রবর্তী (ইতিহাস বিভাগ) ১৩
6. নেতাজীর জীবনে স্বামীজী — রোকেয়া খাতুন (বি.এ. এডুকেশন সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ) ১৪
7. ভাঙড় মহাবিদ্যালয় সবার গর্ব — মহিউদ্দিন মোল্লা (বি.এ. বাংলা সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ) ১৫
8. প্রবন্ধ-এখন নকলের জয় — স্বপন মণ্ডল (বি.এ. তৃতীয় বর্ষ) ১৬
9. প্রেমিকা — মহঃ সাজাহান আলি মোল্লা (বি.এ.) ১৬

Short Story

10. Secret Love — Abhijit Sardar (B.A. Eng.Hon., 1st year) ১৮

Essays

11. The pole of micro-credit to change the rural scenario. — Prof. Dr. T. Banerjee (Dept. of Economics) ২০
12. The Pride and its Stride — Madhumita Majumdar (Lecturer in English) ২১

কবিতা

13. কবিতা — জহর আলী মণ্ডল ২৩
14. পরিযায়ী পাখী — আবুল ফারাক ২৩
15. আশা — দিবস পাত্র ২৪
16. নব যুগবতা — প্রভাস মণ্ডল ২৪
17. পরীক্ষা — মহঃ শাহাজাহান আলি মোল্লা ২৪
18. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২৫
19. অভিযোগ — জয়নাববানু খাতুন ২৫

20. উত্তরনের পথে — সঞ্চয় পাত্র ২৬
21. মোদের কানু — ভাস্কর সরদার ২৭
22. সুনামী — নাইমুল ইসলাম মিস্ত্রী ২৭
23. সবুজের মান — সনৎ মণ্ডল ২৮
24. ক্ষণিকে ভালোবাসা — বাসুদেব মণ্ডল ২৮
25. শেষ দেখা — আশিষ বিশ্বাস ২৮
26. নববর্ষের শপথ — সুকুমার জানা ২৯
27. সন্ত্রাসবাদ — সেখ সহিদ হোসেন ২৯
28. সূর্যদেব — দেবজিৎ বিশ্বাস ২৯
29. ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় — অর্চিতা মজুমদার ৩০
30. কেমন প্রগতি — আলাউদ্দিন আল্ আজাদ ৩০
31. নিরুপায় — বাপী মণ্ডল ৩১
32. সমুদ্র — বাদল কুমার দাস ৩১
33. বদলা কথা — মীর রাকীবাল্লা ৩২
34. প্রিয় কবি — মাহামুদ হাসান গাজী ৩২
35. বাংলার মাটি — শশাঙ্ক মণ্ডল ৩৩
36. মুখোষ পরা মুখ — প্রভাকর মণ্ডল ৩৩
37. বন্ধু কাকে বলে — ইসরাফিল গাজী ৩৪
38. সাথী — সফিকুল হক ৩৪
39. ভাঙ্গড় কলেজ আমার গর্ব — সঞ্জয় মণ্ডল ৩৫
40. হাওয়ার নাচন — মনোরমা সিং ৩৫
41. কলেজ জীবন — মোহিত লাল মণ্ডল ৩৫
42. বিরোহী — শুভঙ্কর মণ্ডল ৩৬
43. তুমি যে মোর ভবিষ্যৎ — মহঃ সরিফুল ইসলাম ৩৬
44. আজ-কাল-পরশু — আশিষ বিশ্বাস ৩৭
45. আগামী পৃথিবী — দশরথ হালদার ৩৭
46. তালের বড়া — কারিমা খাতুন ৩৭
47. সৃষ্টির কাছে পত্র — শম্পা মুখার্জী ৩৮
48. ভূত নিয়ে গবেষণা — বাপি কুমার সর্দার ৩৮
49. পরিচয় — মহঃ আয়ুব আলি মোল্লা ৩৮
50. সোনালী স্বপ্ন — স্বপন মণ্ডল ৩৯
51. অরণ্য বাঁচাও — প্রসেনজিৎ মণ্ডল ৩৯
52. কবি গুরু — সানজিরা খানম ৩৯
53. অবুঝ মন — তাপসী বাগ ৪০
54. আমাদের দেশ — গৌতম চৌধুরী ৪০
55. ভুলে যেতে চাই — অপরাজিতা চক্রবর্তী ৪১
56. সম্পর্ক — নীতা চৌধুরী ৪১
57. সুনামী — মহিউদ্দিন মোল্লা ৪২
58. কে তুমি — আলাউদ্দিন আল্ আজাদ ৪২
59. খুঁজি তোমায় — সাহিনা পরভিন ৪৩
60. বন্ধু — সুমন নস্কর ৪৩
61. বিবর্ণ স্বাধীনতা — সুজয় মণ্ডল ৪৪
62. শতবর্ষ পরে — বিশ্বজিৎ কবি ৪৫
63. রাখবে কি মনে — ভাস্কর সর্দার ৪৬
64. Life — Ayan Pal ৪৭
65. Fortune — Debmalya Pal ৪৭
66. The Love — Ruksana Parvin ৪৭

ছোটগল্প

67. শেষ ঠিকানা — তৈয়েবুর রহমান (বি.এ. প্রথম বর্ষ) ৪৯
68. ফেরা — কারিমা খাতুন (বি.এ. এডুকেশন সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ) ৫১
69. বিবেকের ঋণ শোধ — শফিউন্নিসা (বি.এ. এডুকেশন সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ) ৫৩
70. শব্দ জব্দ — মহম্মদ মইনুল ইসলাম (বি.এ., সাম্মানিক বাংলা, দ্বিতীয় বর্ষ) ৫৫
71. Governing Body Members ৫৬
72. TEACHING STAFF ৫৭
73. Non Teaching Staff ৫৮
74. Contractual Staff ৫৮
75. ভাঙড় মহাবিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদ ৫৯
76. ELECTION TO THE STUDENT UNION 2005-2006 ৬০

FROM THE PRINCIPAL'S DESK

I am very happy to know that the fourth edition of **'Sristi'**, the literary organ of our beloved college, is going see the light of the day. As in the preceding years this year too has witnessed continual progress of our Institution, the latest being its assessment and accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) in May 2006. This steady growth of our activities in multifarious dimensions with wholehearted support and cooperation of our students led by the Students' Union of this College makes everybody of us proud. The struggle launched by the people of this locality through the establishment of this college of higher learning should make all of us conscious of tremendous responsibilities in marching ahead with flying colours and let **'Sristi'** be one of the most important mouth pieces that can successfully reflect whatever achievements can be attained by us.

My heartiest thanks and gratitude to all of those-Faculty members, Non-Teaching Staff and Students whose toil helped in the birth of this edifion of **'Sristi'**.

Dr. Pradip Kumar Basu
Principal
Bhangar Mahavidalaya

পত্রিকা সম্পাদকের কলম থেকে

কালস্রোতের চোরাবালিতে হারিয়ে যায় মূল্যবোধ, মানবিকতা ও ভালোবাসা। হারিয়ে যায় নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ। সংসার নামক ক্ষুদ্র শব্দের বেড়াজালে কৈশোর ও যৌবনে দেখা অনেক স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে। তবুও তার মধ্য দিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষ গড় পড়তার মিছিলে সামিল না হয়ে জাগিয়ে তুলতে চায় তাদের সেই পূর্বেকার কল্পনা প্রসূত ইচ্ছাশক্তিগুলোকে দিতে চায় বাস্তবরূপ। আর তখনই আসে নানান প্রতিকূলতা। তবুও সমস্ত প্রতিকুলতাকে দু-পায়ে মাড়িয়ে রঙীন জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে "সৃষ্টির পথ" ধরে এগিয়ে চলে হারিয়ে যাওয়া মানবিকতা ও মূল্যবোধের খোঁজে....।

সামিম আহমেদ তরফদার

সাধারণ সম্পাদকের কলম

"সৃষ্টির" অমোঘ বিধানে, মহাজাগতিক বিবর্তনে গঠিত হয়েছিল এই পৃথিবী, আর জীব জগতের ভারসাম্য রক্ষাকারী স্থল, জল, আকাশ, বাতাস, রৌদ্র ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের। সেই সম্পদ সমভাবে বণ্টিত হওয়া বা ভোগ করা মানুষের জন্মগত অধিকার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের।

কিন্তু কালের বিবর্তনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পরিগণিত কিছু মনুষ্যজাতি সু-বিজ্ঞান ভুলে কু-বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মনোভারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীকে তথা দেশকে ছলে বলে কৌশলে চোরা শোষণে কুক্ষিগত করতে তৎপর। যার ফল স্বরূপ, বিশ্বে জাতপাত নামক বিভেদকামী শক্তি সন্ত্রাস হানাহানি ইত্যাদির মাধ্যমে মারণ মেলায় মানব সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে "সৃষ্টির" উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। এই মারণ যজ্ঞের পুরোহিতগণ (কতিপয়) নিজেদেরকে উন্নততর জাতি ও বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর কৌলিন্যের দাবিদার। বিজ্ঞানকে "সৃষ্টিতে" কাজে ব্যবহার করে পৃথিবীতে অকল্যাণমূলক ধ্বংসের পথে চালিত করতে সাহায্য করছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা কয়েকটি দেশ অর্থের মোহ প্রভূত্ব কায়েম করণ স্বার্থে মারণ অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে। আতঙ্কবাদী, বিভেদকামী, ধর্মকামিতে পরিণত করে সমস্ত পৃথিবীকে এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে চলতে বাধ্য করেছে। অথচ মুখে সাম্যবাদের নীতি গণতন্ত্রের ধ্বজা ও সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবীর মহৎবাণী উচ্চারণে অকপট বুলি, তাই তো ইতিহাসের কথায় বলতে হয়, "সত্য সেকুলাস, কি বিচিত্র এই বিশ্ব, কি বিচিত্র এদের চরিত্র।"

তাই সময় এসেছে সোচ্চার হওয়ার, চক্রান্তকারী, পুঁজিবাদী মানবসম্পদ ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র ব্যবসায়ী বেনিয়াদের স্তব্ধ করার লক্ষ্যে দেশ দেশান্তরের কোটি কোটি নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী আবাল বৃদ্ধ বণিতার কণ্ঠে গর্জে উঠুক ধিক্কার ধ্বনী, গণ অন্দোলনের প্রতিবাদের ক্ষুরধার সরব ভাষা। যে ভাষায় ভয় পাবে অশুভ শক্তি, বন্ধ হবে বিশ্ব নিপীড়ন, বন্ধ হবে অস্ত্র ব্যাসাতী।, ভাঁটা পড়বে ক্রমন্ময়ের দাদাগিরীতে। প্রতিষ্ঠা হবে বিশ্ব কল্যানের রূপরেখা, তৈরি হবে সৌভ্রাতৃত্ব বোধ, অক্ষুণ্ণ থাকবে জন্মগত সাম্যবাদ গণতান্ত্রিক সন্ত্রাস মুক্ত পৃথিবী। তাই শোষণমুক্ত শ্রেণীর প্রতিবাদ পত্র হোক ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা "সৃষ্টি" সার্থকহোক মহাজাগতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সফল হোক কল্যাণকামী বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উত্তর বার্ষিক "সৃষ্টির"।

মৌমিতা আচার্য্য
সাধারণ সম্পাদক
ভাঙ্গড় মহা বিদ্যালয় ২০০৬-০৭

প্রবন্ধ

"পূর্ব ও পশ্চিম—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা

নিরুপম আচার্য
(অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

"ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে। একথা যদি সত্য হয় তবে সেজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

এক বিশেষ ক্রান্তিকালে বসে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ ছিল মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র। সেই ভাবনার পরিচয় পাই কবির বহুল পরিচিত ভারততীর্থ কবিতায়।

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার যেথা হতে যবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলিবে, যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরের তীরে।।

তিনি ব্যষ্টিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, সমগ্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর যেখানে পূর্ণতা সেখানেই মঙ্গলের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে।

"যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ যাহা চরম সত্য তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে।"

পরাধীন ভারতবর্ষের কথা বার বার তাঁর চিন্তায় ধরা পড়েছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্বের জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন। এর প্রকাশ দেখি ও তিনি নানাভাবে করার চেষ্টা করেছেন। কখনো গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, কখনো ইংরেজদের দেওয়া উপাধি পরিত্যাগ করে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইংরেজদের ভারত ভাগের চক্রান্ত সারা পৃথিবীতে যেখানেই মানবতার পরাজয় ঘটেছে তখনই তাঁর লেখনী গর্জে উঠেছে। তিনি এক বৃহৎ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। একদিন এক পরিপূর্ণ মানবের ইতিহাস এক বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করবে এ বিশ্বাস তিনি রেখেছিলেন। সেই জন্য ক্ষুদ্রস্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার আহ্বান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন আমাদের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে—

"ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস নহে আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি তবে আমরাই নষ্ট হইব।"

আমাদের মধ্যে যে অজ্ঞানতা ছিল, যে কুসংস্কার ছিল, যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল তাকে যদি দূর করতে হয় তবে অবশ্যই ইংরেজদের মতো এক দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাবের আদানপ্রদান দরকার একথা রামমোহন, রানাডে, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন। ইংরেজের আগমনে আমাদের জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি ঘটেছিল। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের যে বেড়াজাল ছিল তাও বড়ো ধাক্কা খেল ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। ইউরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া, আমাদের কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে।"

এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের আহ্বান গীতি শুনেছিলেন। উভয় সভ্যতার শিক্ষার মিলন ও জরুরী ছিল তা "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে বলেছেন।

"এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।"

আমাদের পিছিয়ে পড়ার জন্য সবচেয়ে দায়ী আমাদের অশিক্ষা। সেই অশিক্ষা দুর করতে হবে। আর শুধু দেশীয় সম্পদকে আঁকড়ে ধরলে চলবে না আমাদের জ্ঞানকে মুক্ত করতে হবে। আমাদের মধ্যে যে গোঁড়ামি আছে তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আর এর জন্য বাইরের আলো বাতাসের আমাদের বদ্ধ জানালা খুলে প্রবেশ করতে হবে।

রবিজীবনীকার প্রশান্ত পাল এর গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৪ শ্রাবণ কোলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহখানেক অবস্থান করেন। এই দিন এবং ২৭শে শ্রাবণ তিনি বালিগঞ্জে যান। ২৮শে শ্রাবণ তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে ছাত্র সমাজের অধিবেশনে 'পূর্ব ও পশ্চিম' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রমানসের একটি স্পষ্ট দিক পরিবর্তনের আভাস দেয়। তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ নিয়ে ভেবে এসেছেন। বঙ্গদর্শন পর্বেও তিনি অভিভূত হয়েছিলেন প্রাচ্যমহিমার দ্বারা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয় তাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—তখনই রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে অন্যভাবে ভাবতে থাকেন। তিনি বললেন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যা কিছু ভালো তার একীকরণে উপর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সার্থকতা নির্ভর করছে। তিনি মহাভারতবর্ষ গঠনের ডাক দিলেন—

"ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপর পড়িয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছেন—'ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে।" পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের মিলনের যে প্রয়োজন আছে তা শুধু তিনি নন, রাজা রামমোহন ও 'মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়া ছিলেন'—কবি নিজে তা স্বীকার করেছেন।

রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেননি তাকে দেশে কালে প্রসারিত করেছেন। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে তিনি সংযোগ স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম ভারতে রানাডের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি লিখেছেন—"যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দুর করে, জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজন শক্তি, সেই মিলন তত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল"; এরপর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলেছেন।

উপনিষদের অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিম প্রবন্ধের উপান্তে এসে মন্তব্য করেছেন—ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে।

আমাদের মনে হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিগুরু এই বিশ্বাসই সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে ভারত ছাড় আন্দোলনের চরিত্রচিত্রণ

অধ্যাপক অপরূপ চক্রবর্তী
(ইতিহাস বিভাগ)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসাবে সুপরিচিত লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁর সুষ্ঠ সাহিত্যকর্মের মূল বিচার প্রবন্ধকারের শক্তির বাইরেও সাধ্যাতীত। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের কিছু সাহিত্যকর্মের মধ্যে কিভাবে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় বা আগস্ট আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছিল তার ব্যাখ্যা করা। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অনেক সময়ই সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই 'চরিতমানস' উপন্যাসগুলিও ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়কে উপস্থাপিত করে।

এই স্মরণীয় অধ্যায়টি ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি পর্ব যা ভারত ছাড় আন্দোলন নামে পরিচিত ক্রিপস দৌত্যের ব্যর্থতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, জাপানের অগ্রগতি ও ভারতে তার আক্রমণের সম্ভাবনার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভূত হয়েছিল তাতে আর একটা জাতীয় আন্দোলন শুরু হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস ভারত ছাড় প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার আগেই গান্ধীজি সহ বিভিন্ন কংগ্রেসী নেতারা গ্রেফতার হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এবং এই আন্দোলন ছিল ব্যাপক আকারের। বস্তুত ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন চালিয়ে ছিল। একজন ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে "স্বতস্ফূর্ত বিপ্লব" আখ্যা দিয়েছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর দুটি উপন্যাসের মধ্যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের চিত্রায়ণ দেখা যায়।

'জাগরী' উপন্যাসে দেখা যায় যে বিক্ষুব্ধ জনতা অত্যাচার ও পীড়নের প্রতীকগুলির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে সেগুলিকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে। তাদের সংগ্রামের ফলে ব্রিটিশ শক্তির স্তম্ভগুলি যেমন থানা, কাছারি, সব রেজিস্ট্রি অফিস প্রভৃতি ভূমিয়াৎ হয়ে পড়েছে। দরিদ্র কৃষকরা থানা অধিকার করেছে এবং ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে ব্যারিকেড গড়ে তুলেছে। তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে কারণ তাদের আর জমিদারের খাজনা এবং চৌকিদারের কর দিতে হবে না। বিদ্রোহীরা রেল স্টেশন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং গান্ধীজির নামে বিচারসভা চালিয়েছে। অর্থাৎ 'জাগরী'তে ১৯৪২ সালের গণবিদ্রোহের এক আদর্শ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'ক্রান্তি'র যার নেতৃত্বে জনগণের অবস্থান। 'জাগরী' উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র 'বিলু' ও 'নীলু'র মধ্য দিয়ে সতীনাথ সমসাময়িককালের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত টানাপোড়েনকেও অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন।

সতীনাথের অপর উপন্যাস ঢোঁড়াই চরিত মানসে'-ও ভারত ছাড় আন্দোলনের বিবরণ দেখা যায়। এই উপন্যাসেই নিম্নবর্গের দরিদ্র জনগণের ওপর গান্ধীজির অসামান্য প্রভাবও গান্ধীর আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের জল্পনা কল্পনার অনবদ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'গানহীবাওয়া' বার্তা সাধারণ নিম্নবর্গীয় মানুষদের কতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল তা সতীনাথ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এই জনগণই গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। বিসকান্ধা ঘোষণা করে ছিল। "মহাৎমাজি গ্রেপ্তার। হো যাও তৈয়ার।" এরপর বিক্ষুব্ধ জনতা 'তিতলি কুচি' দহন করতেও দ্বিধা করেনি। তারা অগ্রসর হয়েছিল রেল লাইন ধ্বংস করতে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতেও থানা জ্বালিয়ে দিতে।

অনেক লেখকই ভারত ছাড়া আন্দোলনকে এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান বলে গণ্য করেছেন। এই ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন দিকগুলিকে সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেও ঐতিহাসিক বাস্তবকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপিত করেছেন। জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, জনমানস, উত্তাল সময় সব কিছুই তার রচনায় উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতছাড় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক সতীনাথ।

নেতাজীর জীবনে স্বামীজী

রোকেয়া খাতুন
(বি.এ. এডুকেশন সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

আমরা সবাই জানি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। তিনি যেন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন স্বামীজির উদ্দেশ্যকে রূপদান করতে। আসলে তার মধ্যে ধর্মবোধের উন্মেষ ঘটেছিল একেবারেই বাল্যকাল থেকে। মনে রাখতে হবে তাঁদের বিশাল বাড়িটার বাইরের দিক পরিচালিত হত 'পিতা জানকীনাথের' দ্বারা। কিন্তু অন্দরমহলটা ছিল তাঁর 'জননী প্রভাবতী দেবী'র অধীনে। সেখানে ছিল পূজা-আর্চা, ব্রত পার্বনের এক শুচিশুভ্র পরিবেশ। বাল্যকাল থেকেই সুভাষ তাঁর মায়ের এই ধর্মীয় প্রভাবের বলয়ে দিন কাটিয়েছেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার পরও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক অন্তর্মুখী। তাঁর শুধু মনে হত জীবনের উদ্দেশ্য কি? কেন তিনি জন্মেছেন? তাঁরও উদ্দেশ্য কি শিক্ষালাভ, চাকরি, বিয়ে এবং সাংসারিক জীবন নিয়ে কাল কাটানো। সেই অস্থির সন্ধিক্ষণেই হঠাৎ তিনি পেয়েছেন পথের সন্ধান। এবং আত্মীয়ের বাড়িতে আকস্মিকভাবেই হাতে এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের লেখা। ব্যাকুল হয়ে তিনি স্বামীজির সমস্ত লেখা যোগাড় করেছেন এবং তার পরই বুঝতে পেরেছেন যে, যা তিনি এতদিন খুঁজে বেড়িয়েছেন অস্থির হয়ে এবার তার সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—"The teaching of Swami Vivekananda entered the depths of my bones". ক্রমে সুভাষচন্দ্রের মন স্বাভাবিকভাবেই স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়িয়ে তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে গেছে, তখন তাঁর মনে হয়েছে—কেবলমাত্র ত্যাগের মধ্য দিয়ে জন্ম স্বার্থক হয়। জীবন শুধু আত্মসুখের জন্য নয়—পরার্থেই তাকে দান করতে হয়। সুতরাং একদিকে রামকৃষ্ণদেবের ত্যাগ ও শুচিতার আদর্শ আর অন্যদিকে স্বামীজির সেবা ও কর্মের বাণী তাঁর আত্মজীবনে এক অদ্ভুত সংগ্রাম সৃষ্টি করেছিল।

সুভাষচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, 'আমার বয়স তখন সবে পনেরো যখন বিবেকান্দ আমার জীবনে প্রবেশ করলেন।' বিবেকানন্দ শুধু সুভাষের জীবনে প্রবেশ করেননি, চিরস্থায়ী হয়েছেন তার মধ্যে, পরবর্তী জীবনে সুভাষচন্দ্র কোনদিন বিবেকানন্দ ছাড়া হননি।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দের এই 'শিবজ্ঞানে জীব সেবার' ব্রত তাঁর সমস্ত হৃদয়কে করেছিল উদ্বেলিত। কবি ও মনীষী মহিতলাল মজুমদার একজায়গায় লিখেছেন—"নেতাজী সুভাষচন্দ্র হলেন বিবেকান্দের জীবনের জীবন্ত ভাষ্য। স্বামীজিকে না বুঝিলে নেতাজীকে বুঝা যাইবে না, আবার নেতাজীকে না দেখিলে স্বামীজিকে দর্শন লাভ হইবে না।"

বিবেকানন্দের ভারতের জনসাধারণের প্রতি অপার ভালবাসার পাশাপাশি জ্বলন্ত জাগ্রত দেশপ্রেম, স্বদেশের বন্ধন দশার তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রণাবোধ মুক্তির জন্য সর্ব স্বপ্ন, যেন তাঁরই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। আর সে জন্যেই সন্ন্যাসীর উত্তরীয় নিজ অঙ্গে ধারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। গৈরিকের বদলে তাকে সজ্জিত হতে হয়েছিল সামরিক পোষাকে। ধর্ম মহাসভায় উদ্দীপ্ত ভাষণ দেওয়ার বদলে রণাঙ্গনে তাঁকে হতে হয়েছিল সমরবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। স্বামীজিও ছিলেন স্বভাবে ক্ষত্রিয়, বিদেশের মাটিতে ভারতের যোদ্ধা-সন্ন্যাসী। নেতাজী নিজের সন্ন্যাসী রূপটিকে অন্তরে লুকিয়ে রেখে বিদেশে হয়েছিলেন যোদ্ধা। স্বামীজি বলেছিলেন ঃ 'দেশ বীর চাইছে। তাই বীর হও! ভয়শূন্য হও। প্রকৃত মাতৃপূজারী হবে পর্বতের মতো দৃঢ়, সিংহের মত নির্ভীক। হঠাৎ যদি গোটা বিশ্ব ভেঙে পড়ে পায়ের কাছে ধুলো হয়ে যায় তাহলেও তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না।' স্বামীজির আরও নির্দেশ ছিল ঃ "যুদ্ধ কেবল যুদ্ধ অবিরাম যুদ্ধ। প্রতিবার পরাজয় হবে জেনেও যে যুদ্ধ তাইতো শ্রেষ্ঠ বীর ধর্ম।

বিবেকানন্দের এই বীর ধর্মেই দীক্ষিত হল সুভাষচন্দ্র। স্বামীজির আহ্বান ছিল ঃ ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। নেতাজীর 'দিল্লী চলো' আহ্বানে বিবেকানন্দের ধ্বনিরই প্রতিফলন ঘটেছে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সৈন্যদের যুদ্ধ যাত্রায় পাঠানোর সময় তিনি তাদের বলেছিলেন ঃ "তোমাদের আমি দেব ক্ষুধা ও মৃত্যু। হয়তো পথের ধুলিই হবে তোমাদের শেষ শয্যা। তবু এগিয়ে চলো। মাতৃভূমি তোমাদের ডাকছে। লালকেল্লার জাতীয় পতাকা না ওড়ানো পর্যন্ত আমাদের লড়াই থামবে না। চলো দিল্লী"। এই ডাক স্বামীজির মানসপুত্র নেতাজীই কেবলমাত্র দিতে পারতেন এবং দিয়েও ছিলেন।

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় সবার গর্ব

মহিউদ্দিন মোল্লা
(বি.এ. বাংলা সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

দিল্লীর আগ্রাতে গিয়ে যদি কোন সমাজ সচেতন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, 'আপনার অঞ্চলে গর্ব করার মতো বিষয়বস্তু কি আছে?' তাহলে উক্ত ব্যক্তিটি শাজাহান ও মমতাজের স্মৃতি বিজড়িত তাজমহলের কথা বলতে কোন রকম ইতস্তত বোধ করবেন না। তদরূপ ভাঙড় অঞ্চলের মধ্যে যে কোন শিক্ষিত, সমাজ সচেতন ব্যক্তিকে ঐ একই প্রশ্নের সম্মুখীন করলে, রাজনীতি, ধর্মনীতির উর্দ্ধে থেকে দৃঢ় বাক্যে ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের নাম করতে ভুল করবেন না। উপরিউক্ত শিরোনামটি পড়ে অনেক পাঠক ঠাট্টা ও রসিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ হতে পারেন। আবার অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে নতুন নতুন কল্পনা মিশিয়ে স্বাস্থ্যকর চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হতে পারেন। কারণ ভাঙড় অঞ্চলে নামকরা ভাঙড় হাইস্কুলটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে। তার দীর্ঘ তিরাশি বছর পর ১৯৯৭ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের। ফলে ১৯৯৭ সালের পূর্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য নিকটবর্তী কলেজ বলতে কলকাতাই এ অঞ্চলের একমাত্র অবলম্বন ছিল। অনেক ছাত্রছাত্রীর সাধ থাকা সত্ত্বেও সাধ্যের অভাবে, ছাত্ররা যে কোন কর্মকে এবং ছাত্রীরা বিবাহকে জীবনের শেষ পরিণতি হিসাবে বেছে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রী বংশ পরম্পরায় বিপুল অর্থ ব্যয় করে তাদের উচ্চ শিক্ষার মানকে, তাদের সহজাত ও অর্জিত প্রতিভাগুলিকে বিকশিত করত। দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা যাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে কোলকাতায় পড়তে যাওয়াকে বিলাসিতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারত না। ফলে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বিকাশ ঘটার সুযোগ না পেয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যাদের পূর্বপুরুষরা কলেজতো দূরের কথা ইস্কুলে পর্যন্ত পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। ফলে অনেক গোবর গাদায় পদ্মফুল ফোটানো গেছে এবং সমাজকে কিছুটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছে, এই ভাঙড় মহাবিদ্যালয়।

অন্যান্য সমসাময়িক কলেজগুলির সঙ্গে ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের তুলনা করলে দেখা যাবে এটি ন-বছরের শিশুগাছ, অথচ অল্প বয়সেই এই গাছটি বিপুল শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দূর-দূরান্তের পরিযায়ীরা পছন্দ মতো শাখা-প্রশাখায় বাঁসা বেঁধে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দুইশত ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে যে কলেজ পঠন-পাঠন শুরু করেছিল সেই কলেজের ছাত্র ছাত্রী বর্তমানে দু-হাজার। প্রশ্ন উঠতে পারে এতো ছাত্র-ছাত্রী কেন এখানে ভিড় করে? কারণ এখানে ছাত্রছাত্রীদের উত্তপ্ততার বদলে আছে আসক্তি। দাদাগিরিতার বদলে আছে দাদা সুলভ মনোভাব। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহ প্রতিদান হিসাবে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা, ননটিচিং স্টাফদের পরামর্শ ও সহযোগিতা, ছাত্রসংসদের নেতিবাচক আন্দোলন ও ছাত্র-স্বার্থরক্ষা করা, অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতিত্বের বিপরীতে সমতা, সুদৃশ্য ও প্রচুর রেফারেন্স বই সমন্বিত লাইব্রেরী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন মার্জিত-রুচি সম্পন্ন সুলভ ক্যান্টিন, শরীর চর্চার জন্য মাল্টিজিম, আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্যে কম্পিউটার, পূর্বদিকে সবুজ ঘাস ভরা প্রসস্থ খেলার মাঠ, আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা-আলাদা কমন রুম ও খেলার যাবতীয় সামগ্রী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্যানিটেশন, বিভিন্ন জায়গায় বিশ্রামের জন্য গাছের ছত্র ছাওয়ায় গজিয়ে ওঠা ছোট বড়ো চাতওয়াল, মনহরণকারী উদ্যান, একস্ট্রাকারিকুলামের মধ্যে এন.সি.সি. ও এন.এস.এস. নামক সমাজসেবা মূলক প্রকল্প, এবং সাম্প্রতিককালে জাতীয় মূল্যায়ণ সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত 'বি-গ্রেড' সংশাপত্র যা ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সর্বপরি সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে সম্প্রীতি সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রী এখানে এক স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে যা ভাঙড়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

পরিশেষে একটি অনুরোধ দিয়ে আলোচনার ইতি টানা যেতে পারে। এই মহাবিদ্যালয়ে তিলতিল করে গড়ে ওঠা সাফল্য, উন্নয়নের ধারা, পঠন-পাঠনের মান, এর সম্মান, যেন আমাদের আচার-আচরণের দ্বারা, কাজকর্মের দ্বারা, কখনো ক্ষুণ্ণ না হয়। কারণ আমরা এই স্বর্গ সমান মহাবিদ্যালয়টির সন্তান'এর সম্মান রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যেন সর্বক্ষণ এই কথা বলতে পারি যে, "This is our college, we are proud of it."

প্রবন্ধ-এখন নকলের জয়

স্বপন মণ্ডল
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ)

বর্তমানে আমরা নকল অর্থাৎ মেকি শব্দটার সাথে বিশেষ পরিচিত। তবে নকল শব্দের উচ্চারণ আমরা লিখিত ভাবে ব্যবহার না করিলেও মৌখিক কথার ক্ষেত্রে নকল এর আভাস মেলে। কার্যক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কোন কার্য সফল না হলে নকল-এর আশ্রয়ে কার্য সিদ্ধ করে থাকি। কিন্তু ঐ নকল এর ব্যবহার গোপন করি অন্যের কাছে আর তাকে বোঝাতে চাই আমি যে কার্য সফল করেছি তা সাচ্ছা ভাবে।

আজ একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে নকলকে আশ্রয় করে বহুকর্ম বহাল তহবিল-এ মানুষ চলেছে উদ্যাম উত্তেজনার স্রোতে। আজও অনেক মহান ব্যক্তি বর্তমান যারা এই নকল শব্দটাকে জীবন থেকে এড়িয়ে চলেছে।

নকল এর আশ্রয় বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী নকল করে উত্তরপত্রে উত্তর লেখে। ব্যবসায়ী ব্যবসা ক্ষেত্রে অধিক মুনাফা লাভের জন্য নকলের আশ্রয়, প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে নকল প্রেমাভিনয়, রাজনৈতিক নেতারা জনশক্তির জন্য জনাভিমুখে মিথ্যাভিনয় বা মিথ্যা শপথ প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে আজ নকল-এর প্রচলন হয়ে চলেছে।

আজ সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্রোতে মানুষ কম বেশী নকলের অনুসরণে চলেছে। তবে নকল বা মিথ্যার জয় বর্তমানে হলেও তা ক্ষণস্থায়ী।

প্রেমিকা

মহঃ সাজাহান আলি মোল্লা
(বি.এ.)

আমি তখন সবে মাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ি। তখন এক প্রেমিকার সাথে দেখা হয়। একবার দেখা হওয়ার পর আর থাকতে পারি না। যদি সারা দিনের মধ্যে একবার দেখা না হতো, তাহলে আমার মনের মধ্যে আন্দোলন বয়ে যেত। মনের আন্দোলনকে মেটাবার জন্য দিনের প্রায় শেষ ভাগে দেখা করতাম আমার প্রেমিকার সাথে। স্কুল, বাড়িতে এবং সিনেমার হলে প্রায় সর্বত্রই যেন তাকে পাওয়ার আশা জাগতো। আমার সেই প্রেমিকার পরনে ছিল সাদা ফ্রক এবং পায়ে থাকতো হালকা বাদামী বর্ণের মোজা। প্রেমিকার পা দুটি সব সময় আমার মুখের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ প্রেমিকা তো আর সস্তা নয় যে, যখন তখন তাকে কাছে পাওয়া যাবে। প্রেমিকাকে দেখলে আমার মনের দুঃখ চলে যায়। আর প্রেমিকাকে না পেলে মন পাগল হয়ে ওঠে। আমার প্রেমিকা যার কাছে যায়, তার মনের টেনশান বলে কিছু থাকে না। আমার প্রেমিকা হল সাথী, স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক নাম হল সিগারেট।

Short Story

Secret Love

Abhijit Sardar
(B.A. Eng.Hon., 1st year)

Once there was a poor meritorious student in a village. He was very sensitive. He was a very good boy. He also joined many social service schemes and he wrote many dramas, short stories and also poems. In a word, the boy was a genius. A girl lived in the neighbouring village of the boy studied. They were both in the same class. They were also good friends. Other students talked and wondered about the bond between them. They (the other students) knew that there was some secret relation between them. But they (boy and girl) did n't mind about their comments. The boy passed M.P. examination in 1st division but the girl did not pass. After few days later, they again met. The girl was very sad as she did not pass in the examination. The girl passed the next year in 2nd division. The girl's family members loved the boy. They were both admitted in a college. They enjoyed their college life as firends. A unknown boy, proposed to her. The girl avoided unknown boy. The boy didn't know this matter. One day the girl suddenly asked him (friend), "Do you love me?" The boy was surprised. He wanted to know the reason. The girl said that she can't tell the reason. The boy took time. Actually, the boy was falling in love secretly with girl. But he couldn't speak of his love. When girls family knew of the matter, they gave pressure on the girl. But the girl did not listen to them. The girl's family was very rich family but the boy's family was poor. One day, the girl thought that they must marry. But the boy did not listen to her. After a few days, the girl committed suicide. The boy did not find happiness.

After somedays, the boy died mysteriously. No one knew how he died.

The girl's family told this real fact the author. So it is not a story, it was true. Sometimes love is not respected in society.

Essays

The pole of micro-credit to change the rural scenario.

Prof. Dr. T. Banerjee
(*Dept. of Economics*)

Bangladesh our neighbouring country, got for the first time since its emergence the world's most prestigious award, Noble Prize in the discipline of peace with the hands of the emiment economist Md. Yunus and his Gramin Bank. Mr. Yunus and Gramin Bank establishment were given this award for their remarkable contributions to change the poor economic conditions of the economically weakest section in rural Bangladesh providing the micro-credit facilities.

After the bank nationlisation India's leading banks has extended their services in rural areas. NABARD, the sister concern of RBI, emeged to issuse different kinds of rural credits. Gramin banks were established to curb the dominance of rural money lenders who lend money particularly to poor farmers at much higher rate cf interest.

Despite having these arrangement of providing the rural credit in India, landless labours marginal farmers, become unemployed in major seasons of a year. They are victims of different political parties.No effort are taken to organise them either from financial institutions and or legislative institution like panchayet and Jella Parishad.

It is well known that rural financial institutions like gramin banks, nationalised bank, Co-operative Credit Society are generally to provide loans marginal farmers, landless labours, biri makers and rural artisans, because they are too poor to repay their loans.

But the scene can be changed to some extent like what has been possible in Bangladesh by Md. Yunus and his gramin bank.

If the micro credit is provided not to an individual but on the basis of group, like villagers trained in eretain area like producing bamboo products, biri, bi-products of seasonal different friuts. It is necessary, they are trained to make them more efficient in different areas. For this reason more training institutions are to be opened up in the wake of growing needs for training.

If some individual belonging to the group fails to repay his cerdit that group will remain responsible to rectify the default. performance of groups interms of loan repayment are to be reviewed periodically by the experts of financing institutions. Thus the occurence of failure of repayment, the loans must be minimum as has been in Bangladesh.

The basic goal of providing the micro credit is to make rural people living under proverty line economically self suffiicient.

When the rural poor people particularly the women section become self sufficient, the would feel self confident and self-respecte. They have become complementery in the building the structure of rural economy on solid foundation.

The Pride and its Stride

Madhumita Majumdar
(*Lecturer in English*)

Generations have relived the magic of Jane Austen's **Pride and Prejudice.** The reasons of appeal have remained varied some have fallen for the witty and spirited heroine Elizabeth Bennet or some have vouched by the innocence of Jane Bennet, to some Darcy's enigma has been irrestible; to some reading the feminist angles had been a concern while others enjoyed the romance of the tale. Some where amongst them one that strikes is the resolute Charlotte Lucas. It would not be wrong to say, she alone in the novel represents startling reality, compared to her more famous friend, Elizabeth Bennet, Charlotte covers a few pages in the novel.

The extremely intelligent Charlotte is no match for the pompous and vain Collins (Collins never even for once evokes any respect for his action in the novel); yet, Charlotte's decision to marry Collins is about understanding the politics that the opening line of the novel intended to drive. She realises it is this marriage alone that could provide her with financial security. What is interesting is the fact that she who knew of the limitation well created her own space without Collins realising so! Charlotte in giving Collins the room that overlooks the road engages his attention and and ensures that the pompous Collins doesnot encroach her private space. Her compromise is in tune with the circumstance and the lot of women of the time but Charlotte was unwilling to give up her space that was equivalent to her identity.

Charlotte's creator fully realised the need of space. Almost for such woman in the same tone, Virginia Woolf in her esay, **A room of one's own** would argue for the need of space for the woman. This space that Woolf demanded was for the woman's liberation. The liberation of her thoughts that she had been forced to keep in the closet. It is such gestures that would begin the woman's realisation of her self and identity and consequently lead to the much needed financial independence. Charlotte who was living during the time could not be allowed the financial independence as no profession was open to the woman except that of a governess. Charlotte's assertion of the need of space was recognising the woman as an individual!

কবিতা

পরিযায়ী পাখী

আবুল ফারাক
(বি.এ. সাধারণ, প্রথম বর্ষ, রোল-৩)

পরিযায়ী পাখিরা সব
আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে
বসছে তারা ঝিলের ধারে
নদীর বাঁকে বাঁকে
তারাই নিয়ে আসছে দেশে
বার্ডফ্লু রোগ
খামার বাড়ির চাষীরা সব
করছে পালন শোক
মুরগী মরে দলে দলে
খামার ফাঁকা তলে তলে,
হোটেলে তাই নেইকো চিকেন
আছে ডিমের কারী।

কবিতা

জহর আলী মণ্ডল
(অধ্যাপক, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়)

"কবিতা আজকে তোমায় দিলাম ছুটি।"
চেতনার রাজ্যে লেগেছে আগুন,
যে আগুণে পুড়েছে আমার স্বপ্নের কাব্য।

* * * * * * * *

স্বপ্ন মুক্তি পেল, সাধনা সার্থক হোল
রচিলাম মোর কাব্য।
কাব্যের নায়িকা কবিতা,
কবিতার হাঁসিতে পাঠক মুগ্ধ হোল,
পাঠক কবিতার ছোঁয়া পেতে চাইল,
পাঠকের স্পর্শে কবিতা রোমাঞ্চিত
হতে লাগল।
রোমান্সের ছোঁয়ায় কবিতা—
আমার কাব্যগ্রন্থ থেকে মুক্তি পেতে চাইল।

চেতনার রাজ্যে আগুন লাগিয়ে,
কবিতা, মুক্তি পেলে।
কবিতার ছলনার ভালবাসায়,
কাব্যের নায়কের মৃত্যু হোল।
পাঠক দুঃখ পেল,
আমি নিঃস্ব হলাম।

নব যুগবতা

প্রভাস মণ্ডল

(বি.এ., সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

ওগো নব অবতার,
তুমি মোদের স্বামীজি।
ধ্রুব তারার মতো আছো তুমি,
নীল গগনের মাঝে,
ওগো মোদের নব জীবনেরসহ যাত্রিনী,
তুমি তো মোদের স্বামীজী।
তুমিতো ছড়ালে এই পৃথিবীতে,
প্রেম-প্রীতি ভাষা, মোদের বাংলা ভাষা।
তুমিতো দেখালে নব দিগন্তের পথ।
তুমি দেখালে রাতের পরে,
আসে নতুন প্রভাত।
তুমি যে দেখালে স্নেহের কুঠারে,
আঘাত আনা সে যে
কি মর্মান্তিক ব্যথা
তুমিতো জানালে,
শিক্ষা এক মাত্র পারে,
আঁধারে আলো জ্বালতে।
তাই তো তুমি আজও আছো,
জীবিত মোদের মাঝে,
নব যুগবতার হয়ে।

আশা

দিবস পাত্র

(বি.এ. সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

শতাব্দী আমায় শিক্ষা দিল
প্রেমী হতে মন রে,
ভালোবাসা পাবার মন্ত্র আমি
শতাব্দীর কাছে পাইরে।
বৃহস্পতির কাছে শিক্ষা পেলাম
প্রেমের বেগে চলতে,
পেয়ে না পেলাম ভালোবাসা
পেয়েছি শুধু বেদনার নেশা।
আপন প্রেমে কঠোর হতে
পাশান হল বক্ষ,
শতাব্দী তার সহজ প্রেমে
ভালোবাসা জাগালো আমার প্রাণে।
এই মনেরি বিরাট পাতায়,
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি যে সব তোমার প্রেমে
ভালোবাসার সন্দেহ নেই মাত্র।।

পরীক্ষা

মহঃ শাহাজাহান আলি মোল্লা

(বি.এস.সি সাধারণ প্রথম বর্ষ)

পরীক্ষা যে এসে গেল চিন্তা করে মরি।
ভাবছি এখন বিজ্ঞান কোথা থেকে পড়ি।
আর আছে ঐ, ইংরাজীটা যত নষ্টের গোড়া।
উল্টোপাল্টা বানান, ফেল করবার সেরা।

ভূগোলটা যতই পড়ি মনে থাকে না মোটে।
নম্বর যতো সব বাংলার ব্যাকরণে আছে।
আর আছে ঐ ইতিহাসটি যত সব গল্প।
পড়াশুনা না করলে নম্বর হবে অল্প।

অঙ্কশাস্ত্র ভাল শাস্ত্র প্যাকটিস না করলে,
জ্যামিতির প্যাঁচে পড়ে হবে জিরো।
আর আছে ঐ অর্থনীতিটা সংজ্ঞা সূত্রে ভরা।
বলতে পার কেমন করে পরীক্ষা দেব মোরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল

(বি.এ. বাংলা সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

তুমি তো কবি বিশ্বকবি
এই বিশ্বধারা তলে।
তুমি তো গুরু সবার গুরু।
এই ভুবনেরি তলে।
লিখেছো তুমি অনেক কবিতা
লিখেছো তুমি গান।
তোমার গানে ঘুম ভেঙে যায়
এই ভুবনেরই তল
লিখেছো তুমি ছোট গল্পের
অনন্ত সম্ভার।
লিখেছো তুমি উপন্যাসের
বিস্তার ময় রূপ।
পৃথিবীকে ভালোবেসে তুমি
লেখায় দিয়েছো তার রূপ।
অনেক ভাষাতেই আমরা তাই
পেয়েছি তার রূপ।

অভিযোগ

জয়নাববানু খাতুন

(বি.এ. সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

ভাগ্য যদি তোমার কাছে
থাকতে না চায় অচঞ্চল।
আটকে রাখো গায়ের জোরে
নেই কি তোমার বাহুর বল?
নিদয়া ঐ দেবীর কৃপা,
দস্যু সম লুট করে নাও;
নিঃশেষে সব নিঃস্ব করো,
ভাণ্ডারে তার যা কিছু পাও।
অন্য জনের আলিঙ্গনে,
ভাগ্যদেবী থাকেন যদি
তোমার ঘরের দেবীর দেউল
শূন্য রবেই নিরবধি।

উত্তরনের পথে

সঞ্চয় পাত্র
(বি.এ. সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

একটা অস্পষ্ট হাতছানি, রহস্যের অলিগলি থেকে
সকলকে ডাকছে পঙ্কিল নগরের তীরে;
মানুষ রাতজাগা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে তাই
যেতে চায় সেই জনমানবের ভিড়ে।

একদিন আমাদের হাত হবে বড়
হতে হবে উচ্চ থেকে উচ্চতর;
চুপি চুপি কখন, একা একা তাই
ইট, পাথর, বালি করেছি জড়ো।

ছলনা করেছ মানব, এইভাবে মায়াজাল পেতে
শোনেনি বাস্তুহারারা মানুষের কোলাহল;
অনন্তকাল ধরে যুদ্ধ হিংসায়
গড়ছে আজও কংক্রিটের জঙ্গল।

কিন্তু আজ সেখানে সূর্য হাসে না
যুবরাজ আর রাজকন্যার ও দেখা নেই;
গাছে গাছে কাশছে কালি ও ধোঁয়াশার রেখা
বিদায় নিয়েছে বিহঙ্গী বিদর্ভ নগরে বহু বছর আগেই।

জানি না তারা ফিরবে কি ফিরবে না?
তবুও তো পশ্চিম আকাশের সূর্যোদয়ের গান ভেসে আসে;
গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়
জোনাকি অন্ধকারে ঝিলমিল জ্যোৎস্নায় ভাসে।

ছলনা করেছ মানুষ, তবুও তো অমৃত হৃদয়ের টানে
যুদ্ধ, হিংসা ফেলে ফিরে যেতে পার নবীন নগরীর দিকে।
বিভৎস অন্ধকার কেটে যাবে প্রত্যেকের ভালোবাসায়
মুছে যাবে যন্ত্রণা চেতনার উৎস থেকে।

আমরা তাই আবার সেই প্রেমারন্যের দিকে ফিরে তাকাব
ঘুমিয়ে পড়ার অনেক আগে খুলে দিয়ে যাব দ্বার,
নব-জন্মকে বলে যাব আমাদের ভালবাসার কথা
দিয়ে যাব এই সুন্দর পৃথিবীর ভার।

মোদের কানু

ভাস্কর সরদার
(বি.এ. সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

বেঁটে করে শক্ত-পোক্ত ছিল মোদের কানু
কর্মেতে তার নেইকো জুরি প্রয়োজনে হতো নতজানু।
দারিদ্রতার মধ্যে গেছে অনেকগুলি বছর
দিয়েছিল সঁপে মালির হয়ে শেষ কয়টি বছর।
অনেক কষ্টে পেয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ কাজ
করতে কাজ যে কোন মূল্যে ছিল না ভয়-ভীতি-লাজ।

খুব সকালে লাগতো কাজে চলতো সারা দিন
আনন্দে সেবা করে যেত বাজিয়ে মধুর বীন।
হরেক রকম গাছ লাগাত চামেলি, চাঁপা, পুঁই।
রঙবে রঙের ফুল ফুটতো গোলাপ, গাঁদা, জুঁই।
পাঁপড়ি নেড়ে স্যালুট দিত, পাতা নেড়ে গান
খুশিতে মন ভরে উঠতো ভরতো কানুর প্রাণ।
তাইতো কানু নিপুণভাবে করতো তাদের সেবা
দেখে সবাই অবাক হতো বুঝতো তাকে কেবা।
মাঝে মাঝে চলতো ঠাট্টা কালা কানুর কান
বুঝতো না সে হাসি-ঠাট্টা কাজই আমার মান।
কিন্তু তবু শুনতে পেত বোবা গাছের তান
বলতে কথা ছিল না আর কোন অভিমান।
কোথায় যেন হারিয়ে গেল! মনে বিধেবান
রেখে গেল কলেজ কানন নেতাজী রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মান।

সুনামী

নাঈমুল ইসলাম মিস্ত্রী
(বি.এ.,সাম্মানিক প্রথম বর্ষ)

তিন অক্ষরের নামটি তার
শুনতে বড় মধুর
ধ্বংসের লীলা খেলায়
গিয়েছে সে বহুদুর।।
নিয়েছে কত ঘর বাড়ী
নিয়েছে কত প্রাণ,
নিয়েছে তোমার আমার
ভাইয়ের প্রাণের স্পন্দন।।
সাত সকালে দেখা গেল
শুধু জলের ঢেউ,
এত জল কোথায় ছিল
বলতে পারো কি কেউ?
বিজ্ঞানীরা হার মেনেছে
সৃষ্টিকর্তার কাছে,
যতই তারা বড়াই দেখাক
তারা নাচে বিধাতার কাছে।।
বলতে পারবে তুমি ওগো
কোথায় তার উৎস এবং কিবা তার নাম?
অবশেষে যারা দিয়েছে সাহায্যের জন্য ত্রাণ
তাদের জানাই আমি আমার
আন্তরিক প্রণাম।

সবুজের মান

সনৎ মণ্ডল
(বি.এ. প্রথম বর্ষ)

তুমি সবুজের সুন্দরবন
তোমার নাইকো কোন প্রাণ।
জীবকে করিয়াছো
তোমার মনের প্রাণ,
তুমি বাংলাকে করেছো
অভিনবত্তের মান।
নতুন জীবনে এনেছে ধারা
ফিরেছে নগরে নতুন তারা,
হিংসাকে হিংসা মনে করে যারা
তাদের নেই কোন অপরূপ সুন্দর ধারা,
তাই দিয়াছো আলো, সবুজের ধারা
মিটায়েছো মনের তারা।
এসেছে আলো এসেছে বাতাস
নতুন করেছো জীবনের ইতিহাস।।

শেষ দেখা

আশিষ বিশ্বাস
(অধ্যাপক, ভাঙ্গড় কলেজ)

রাঙা আলো দেখেছিলেম,
ফাগুন ফাগুন মুখ,
দেখেছিলেম মেঘের ফাঁকে,
আকাশ ভাঙ্গা সুখ;
পড়ে ছিলেম সিক্ত চোখের
বাঁকা ঠোঁটের ফাঁদ;
ভেজা গলায় রাঙিয়ে ছিলেম,
ধূসর মেঘের ছাদ;
দেখেছিলেম রঙিন সাজে,
এগিয়ে যাওয়া সুখ;
আড়াল থেকে দেখেছিলেম,
ফাগুন ফাগুন মুখ।।

ক্ষণিকে ভালোবাসা

বাসুদেব মণ্ডল
(বি.এ., সাধারণ, তৃতীয় বর্ষ)

ক্ষণিকের তরে দেখা হয়েছিল মিলনের সুরে কথা
বিরহের তীরে ভেসে গেল হৃদয়ের ভালোবাসা।
এমন শুধু প্রতিক্ষার পালা, কখন সূর্য ডোবে
ভালোবাসা কারে কয়-বোঝে না তো সে।
নাটকের তরে দিয়েছিল কথা ভালোবাসার তীরে ব্যথা
জীবন নদীরকূলে দাঁড়িয়ে দেখেছিল স্বপ্ন কত।
ক্ষণিকে তারে ফিকে হয়ে গেছে ভালোবাসার সব রঙ
একরাশ স্বপ্ন দেখেছিল নীড় বাঁধবে বলে
সময়ের গতিতে থমকে গেল জীবন ধারা
কথা দিয়ে কথা রাখেনি, অপেক্ষা করেনি কেউ।

প্রেম কথার খেলা, নিজের স্বার্থ ছুঁড়ে ফেলা
নীড় ভাঙা কোন পাখির বেদনা, জাগাতে পারে হৃদয়ের চেতনা
কোথায় সেই জীবন দর্শন, আজ একলা বসে অশ্রুবর্ষন
মনের ভিতরে শুধু হাহাকার, দুঃখ বেদনা যেন একাকার স্বপ্ন
যেন স্বপ্নই রয়ে যায়, ভালোবাসা ব্যথা দিয়ে যায়
স্মৃতি যেন নাড়া দিয়ে যায় হৃদয় তবু বোবা কান্না হয়ে রয়।
ঝড়ের হাওয়ায় ডানা মেলে সবাই গেল আমাকে ফেলে
ক্ষণিকের মিলনে জোয়ার এসে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে।

নববর্ষের শপথ

সুকুমার জানা
(বি.এ. প্রথম বর্ষ, সাম্মানিক)

প্রভাত হল উঠিল সূর্য
নববর্ষের প্রারম্ভে।
দিগ দিগন্তে সকলি ভুলিয়া
এস মিলি পরস্পরে।
কত সুখ কত দুঃখ গিয়াছে বছর পুরিয়া
অতএব মানুষের শান্তি চাই বছরের শুরুতে।
কত রাগ কত বিবাদ হল পরস্পরের।
একে অপরের বিনাষ চেয়েছে নিজের স্বার্থ তরে।
করুণার পাত্র সে নয় দয়াহীন এমনে,
সকলকে ভালবাসিতে এই যেন সদা থাকে মনে।
নিজ স্বার্থ হল ব্যর্থ এই ভেবে মনে
অপরের করিব ক্ষতি না যেন জাগে মনে।
এটা সদা জানিবে তুমি—
অপরের তরে যে ক্ষতি চাহিবে,
সেই ক্ষতি হবে তোমার ক্ষণেক পরে।
অপরের মরনের জন্য যে কূপখনন করিলে।
জানো নাকি তুমি পড়িবে তাতে সকলের আগে।
তাই বলি সকল মানব জাতিকে,
এহেন কুকর্ম ছাড়িয়া দিয়া
মিলি একে অপরের ভাই বলে।

সন্ত্রাসবাদ

সেখ সহিদ হোসেন
(বি.এস.সি প্রথম বর্ষ, রোল-৬)

তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ, ওদের পদশব্দ?
রক্তলোলুপ হিংস্র অট্টহাসি গৃহকোণ?
বাতাসে বাতাসে বারুদের গন্ধে শ্বাসকষ্ট
রক্তনেশার নতুন আহ্বানে।।
ঢেউ এর তালে স্বার্থপরতার ভয়াল তরী নাচবে আনমনে,
হিন্দু না মুসলিম এই বিভেদের ক্ষণেক্ষণে।
কি প্রভঞ্জনে জন্ম লভিছে—
এই মরণ বিষের আবেগ বারে বারে।
পরিহাস করে যা আছড়ে পড়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দ্বারে।
তাজা প্রাণের বিপুল স্রোতে—
সাফ হয়ে যাবে সব মলিনতা অদূর আশাতে,
ডাকছে তরে বিশ্ব জননী আবার
তোদের জাগাতে।।

সূর্যদেব

দেবজিৎ বিশ্বাস
(বি.এ. সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ নক্ষত্র।
আলোয় ভরেছো ভুবনের যত্রতত্র।।
তুমি জগৎকে করেছো আলোয় আলো।
তাইতো আমরা রয়েছি বড়ই ভালো।।
দিয়েছো আলো যেথা রয়েছে পাত্র যত।
তোমার সামনে তাই করি মাথা নত।।

তোমার জ্যোতি সর্বব্যাপি, করে দ্রুত রান।
তুমিই দেবতা বড় সর্বশক্তিমান।।
বিশ্বজয়ীদের দেবে নিজের যতন।
রাত্রি শেষ হলে আসবে তুমি যখন।।
তোমার জন্যই জন্মেছে জীব জগৎ।
সুন্দর পৃথিবী তাই রয়ে গেছে সৎ।।
পৃথিবী সৃষ্টি তোমা থেকে তুমিই জ্যেষ্ঠ।
প্রাণী উদ্ভিদ সবার কাছে তুমিই শ্রেষ্ঠ।।

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

অর্চিতা মজুমদার

(বি.এ. প্রথম বর্ষ)

বিদ্যাতীর্থ ভাঙড় মহাবিদ্যালয়
যেটা আমাদের কাছে হল,
সর্বশিক্ষার আলয়।
এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা
সবাই জ্ঞানীগুণী জন,
তাইতো আমরা সবাই
তাদের কথা মানি সর্বক্ষণ।
বছর বছর এই বিদ্যালয়
করে ভালো ফল,
তাইতো বহুদূরে থেকে
আসে ছাত্রছাত্রীর দল।
লেখপড়ায় ভালো হয়ে
করলাম ভালো ফল,
তাইতো আমার জীবনের আশা
হল না বিফল।
জীবনের সব পরীক্ষায় যেন
সফলতা লাভ করি,
তাইতো আমি সবার কাছে
এই আর্শীবাদ কামনা করি।

কেমন প্রগতি

আলাউদ্দিন আল্ আজাদ

(বি.এ. প্রথম বর্ষ)

একি অরাজকতা মাটির পৃথিবীতে?
আজও প্রভেদ ধনী গরীবেতে।
দেখাবে অনলবর্ষী আঁখি তাকে,
নিষ্ঠুরভাবে খাটাবে।
দেবেই বা কত মজুরী তাকে?
দেখিনু সেদিন পথে যেতে যেতে
বাড়ি থেকে বার করে দিল এক ভিখারীকে
বুক ফেটে গেল প্রতিবাদের যন্ত্রণায়।।
উন্নতির চরম শিখরে উঠেছি আমরা,
তৈরি করেছি গগনচুম্বী অট্টালিকা, এ.সি., ফ্যাক্স,
তাতে অধিকার নেই কিন্তু তার
সে চায় শুধু সৎ ভাইয়ের মত একমুঠো ভাত,
এতেই তুষ্ট তার হৃদয়।।
কেন থাকবে একটি শিশু
রেলওয়ে শেডের নিচে,
প্রগতি?

মানুষের? কোন মানুষের?
হয় যদি কেবল ধনীদের তবে,
তাহলে শত ধিক এমন প্রগতি রে।।

নিরুপায়

বাপী মণ্ডল

(বি.এ. সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

প্রথম দেখি তোমায় বাসে
সেদিন পড়ি প্রেমের ফাঁসে।
দেখছিলাম তোমায় বিভোর নয়নে
মোরহৃদ অন্তরের শয্যা শয়নে।
কি অপরূপ সুন্দর তোমার কেশ
মোর হৃদয়ের তখন আলুথালু বেশ।
তোমার পরনের ওই গাঢ় নীল শাড়ী
যেন খণ্ড খণ্ড মেঘের মাঝে ছোট্ট একটি বাড়ি
তোমার ওই সুন্দর কানের দুল
আমার সারা মনকে করে বড় আকুল।
তোমার মুখের সুন্দর ঐ টোলফেলা হাসি
হায়! ওকে যে আমি বড্ড ভালোবাসি।
তোমার ঐ অপরূপে রূপের শোভা
যেন সদ্য প্রস্ফুটিত সরোবরের পদ্মের রূপের প্রভা।
তোমার রূপের নেই কোন উপমা
তাইতো তোমাকে বড্ড ভালোবেসে ডাকি,
ওগো মোর নিরুপমা।।

সমুদ্র

বাদল কুমার দাস

(বি.এ. প্রথম বর্ষ)

আমি এক গভীর অতল সমুদ্র,
আমার উপর ঘুরে বেড়ায় কতশত জাহাজ,
এই জাহাজের ভিতর শত শ্রমিক করে কাজ।
দুরন্ত ঢেউ যখন করে উৎপাত,
ঠিক তখন
ঐ বৃহৎ জাহাজটা হয়ে পড়ে কাত।
তলিয়ে যায় বড় ঐ জাহাজটা।
জানি, ভালো করলাম না কাজটা,
বিশ্বাস করো আমি করতে চাইনি কাজটা।
তবু কোথায় যে কি হয়েগেল।
আমি পারিনি সামলাতে আমার ঢেউগুলো।
আর ঐ দুষ্টু বাতাসটা
ঢেউ গুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে যায়।
বার বার বাতাসটা চায় জোর করে।
ঢেউগুলোকে উত্তাল করতে।।
বাতাসের হাত ধরে ছুটে যায়,
ঢেউগুলো জাহাদের দিকে।
নতুন উন্মাদনা নিয়ে ধাক্কা মারে,
জাহাজটাকে থেকে থেকে।
দুর্বল করে দেয় জাহাজের চালকের আত্মবিশ্বাসটাকে।।
শেষে অতল গভীরে তলিয়ে দেয় জাহাজটাকে
মানুষেরাভাবে আমি নাকি সদা থাকি রুদ্র।
এটা ঠিক আমি নই ক্ষীণ ক্ষুদ্র।
শুধুমাত্র আমি এক অতল অগভীর সমুদ্র!

বদলা কথা

মীর রাকীবাল্লা
(বি.এস.সি, সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

আমি জেনো বিশ্ব কালো,
ময়লা কয়লা আমার নাম।
হতে পারি কালো আমি,
কিন্তু আমার অনেক দাম।
বহুনামে পরিচিত
কেহ বলে কালো সোনা।
কারো সাথে সিকতে আসার
নেইতো নিষেধ নেইকো মানা।
আমার মাথায় আগুন দিলে
হই টুকটুকে আমি লাল,
কি বলব আমার কথা
হায়রে আমার পোড়া কপাল!
আমার খোঁজে ছুটবে মানুষ
দেখছি সারা চরাচরে।
সন্ধান পেলে
যত্রতত্র খনন করেন,
এই আমার পরিচয়।

প্রিয় কবি

মাহামুদ হাসান গাজী
(বি.এ. সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ
এই বাংলায় জন্ম নিয়েই
করেছো তুমি বাজিমাত।
তাইতো আজি সাহিত্যের
পাতায় পাতায় তোমার নাম।
কবি হয়ে জন্ম নিয়েই
আজকে তোমার অনেক দাম।
তোমার কবিতা পড়তে আমার
লাগে যে বড়োই ভালো,
বিশ্ব কবি হয়ে তুমি
সাহিত্য করেছো আলো।
তুমি যে আমায় মন মাতানো
মস্ত বড়ো সাহিত্যিক,
তাইতো তোমার সাহিত্যে
হয়েছি পাগোল প্রেমিক।
হৃদয় মাঝে আমি শুধু
তোমার ছবি দেখি,
তাইতো তুমি মনমাতানো
আমার প্রিয় কবি।

বাংলার মাটি

শশাঙ্ক মণ্ডল
(বি.এ. সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ)

বাংলার রূপ দেখেছি আমি, শুনেছি শ্যামার গান
বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর রেখেছেন বাংলার মান।
কামিনী রায়, সুকান্ত, নজরুলের এই দেশে
জন্মেছিল এই বাংলায় মহা মানবের বেশে
শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রে আর মধু কবি
এই মাটিতে জন্মেছিলেন বিশ্বকবি রবি।
কবি ছিলেন না শুধু, ছিলেন মহানায়ক
হেমন্ত, মান্না, কিশোর কুমার এই দেশেরই গায়ক।

গাছে গাছে ফিঙে নাচে চড়ুই করে খেলা
বসন্ত ঋতু এলে পরে ফুলের বনে মেলা।
সারা পৃথিবী ঘুরেও আমরা পাবোনা এমন দেশ
এই মাটিতে হেসে খেলে আজি মোরা বেশ।
ফলমূল, ধানগ্রাম সব নিজেদেরই বোনা,
এই দেশের মাটি, মাটিতো নয় যেন কাঁচা সোনা।

মুখোশ পরা মুখ

প্রভাকর মণ্ডল
(বি.এ. সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

চলার পথে অনেক বন্ধু পেলাম
পেলাম না মনের খবর,
আঁধারে আঁধারে রয়ে গেলাম
পেলাম না সন্ধান আলোর।
ভালোবেসে কেহ করে
ঠকাবার ফন্দি
মহৎ সেজে কেহ
করে অভিসন্ধি,
সত্যের ভান করে
মিথ্যা কথায়
আসল গোপন রেখে
নকল দেখায়,
বুঝবো কেমন করে
কে সাধু কে চোর?
গোলক ধাঁধার এই দুনিয়ায়
নাই যে কিছু চেনার উপায়।
মুখ ঢাকা দুশমন
সাধুর মুখোষে
অভিনয় করে কহে
ছদ্মবেশে,
পর্দার আড়াল থেকে
কালো হাত
সরল হৃদয়ে দেয়
যে আঘাত,
চিনবো কেমন করে
দু-চোখে দিয়ে দেখি ঘোরা
চলার পথে অনেক বন্ধু পেলাম
পেলাম না মনের খবর।।

বন্ধু কাকে বলে

ইসরাফিল গাজী

(বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

বন্ধুত্ব হল, অত্যন্ত মূল্যবান একটা সম্পর্ক।
বন্ধু মানে রোজ তার সঙ্গে দেখা হতেই হবে
এমন নয়। অনেকের সঙ্গে অনেকের বন্ধুত্ব থাকে,
যার সঙ্গে হয়তো রোজ যোগাযোগ হয় না।
কিন্তু চেতনা থেকে যায় যে, সুসময়ে আপদে
বিপদে সব সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়াবে।
আজকালকার দিনে সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া
মুশকিল। বোঝা যায় না কে সত্যিকারের বন্ধু।
একমাত্র বিপদে পড়লে বোঝা যায় কে
সত্যিকারের বন্ধু। আমার মনে হয় সৎ
শিক্ষায় মানুষ হলে বন্ধুত্ব কার সঙ্গে হবে
এটা চিন্তা করতে হয় না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়
দেখেছি যে সমবয়সী ছেলে বা মেয়েরাই সব
চেয়ে বেশি ভাল বন্ধু হয়। ছেলে মেয়ে-কার
সঙ্গে কার সঠিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে এটাই
সম্পূর্ণ মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে।
'বন্ধুমানে রামধনুর মত
জীবনের ঝড়ের সময়ে
সে আলো দেখায়।'
'নিজের ওপর ভরসা যখন টলে যায়,
প্রকৃত বন্ধুই হারানো আত্মবিশ্বাস
ফিরিয়ে আনে।'
'বন্ধু হল দুই দেহে এক আত্মা।'

সাথী

সফিরুল হক

(বি.এস.সি., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

সাথী হারা জীবন নিয়ে চলবো মোরা সবাই।
এটাই যদি কাম্য হয় কিছুই করার নাই।
এই সাথী বিনা হয় না গাড়ি, হয় না কোন ধন।
তবুও আমরা সাথীর স্পর্শ; নিয়না কোন ক্ষণ।
সাথী যাদের সঙ্গে থাকেন, তারাই মহান হন।
এই সাথী নিয়ে কত কিছুই করলেন মিলটন।
তবুও আমরা বুঝতে পারি না, কোথায় সাথীর বাড়ি।
খুঁজতে থাকি মনের মাঝে, উজান মেঘের পাড়ি।

আজকে সাথী গেলেন যারা তারাই সমাজের শ্রেয়।
এমন সাথী তুমিও পাবে, থাকে যদি তোমার নম্রেয়।
কেউ কি আমরা সাথীকে, ধরতে চাই না কোন দিনও
সাথী মোদের রঙ্গমঞ্চকে ভাঙতে সক্ষমও।
আজকে আমরা সভ্য জগতের সভ্য নাগরিক।
তাই সাথী বিনা চলবো না কেউ!

ভাঙ্গড় কলেজ আমার গর্ব

সঞ্জয় মণ্ডল

(বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

একদিন জন্ম নিলো ভাঙ্গড়ের বুকে এক দুর্ভাগা কলেজ।
সেদিন ছিল ছোট একটি চার দেওয়ালের ঘর।
কত দিনের অপেক্ষায় উঠলো সে তো বেড়ে।
সেখানে ছিল শুধু কয়েকটি কলেজের ছেলে।
ক্লান্তিতে হায় ছিল এই কলেজের তরে।
কত মানুষের ভাবনায় গড়ে উঠেছিল এই কলেজ।
এখন খুশি শুধু নয় ভাঙ্গড় থানা
খুশি এখন সন্দেশখালী-মিনাখাঁ-হাড়ুয়া থানা।
সব থানার মানুষ করছে এখন ভাঙ্গড়ের স্মৃতি বহন।
এই কলেজটি হলো যখন ছোট থেকে বড়
ছুটে এলো তখন সব মানুষ গুলো।
দেখলো যখন ভাঙ্গড় কলেজ ফুলের বাগানে সাজানো
মনের খুশি নিলো তারা ন্যাকের অধীনে।
শ্রেষ্ঠ হলো ভাঙ্গড় কলেজ সব কলেজের পাশে।
তাইতো আমি ভালোবাসি ভাঙ্গড় কলেজকে মনে।

হাওয়ার নাচন

মনোরমা সিং

(বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

উত্তরেতে বহিলে হাওয়া
শীতেতে হাড় কাঁপে।
দক্ষিণা বায়ু দিলে পরে
নদী সাগর ফাঁপে।
পূবের হাওয়া বাদল দিনে
ধরায় নিম্ন চাপ।
পশ্চিমেতে ঝড়ের গতি
ছিন্ন ছাড়র চাপ।
ভোটের হাওয়া এলে পরে
নেতারা এসে জোটে।
পালে হাওয়া লাগলে পরে
বোট নৌকা ছোটে।
বিশ্বকাপের হাওয়া এলে
টিভির সামনে মাতে।
শীর্ষস্থানে লাগিয়ে হাওয়া
বিশ্বকাপটি জেতে।

কলেজ জীবন

মোহিত লাল মণ্ডল

(বি.এ. জেনারেল, প্রথম বর্ষ)

ছাত্র জীবন ছাত্র জীবন
কলেজ জীবন ভাই।
স্কুল জীবন পার করেই
কলেজ জীবন পাই।।
ভাঙ্গড় কলেজ লাগে সবার ভালো
তাইতো সকল ছাত্র-ছাত্রী জ্বালতে আসে মনের আলো
কলেজে আছে পিতৃ তুল্য স্যার
আর আছে মাতৃতুল্য ম্যাম।।
কলেজ জীবনে আছে বাঁধন ছাড়া হাসিখুশি
আর আছে দাদা-দিদিদের ভালোবাসা।
কলেজ মানে পড়াশুনা শুধু তাই নয়
আছে অনেক আচার অনুষ্ঠান মনে রেখো ভাই।

বিরোহী

শুভঙ্কর মণ্ডল

(বি.এ., সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

আশার মুকুল ঝরে গেছে আজ
খুলে গেছে দুটি আঁখি।
বুঝেছি আজ বাসেনি ভালো
সে আমার দিয়েছে ফাঁকি।
আজিকে আমার সকল আশার
হয়েছে অবসান।
হৃদয় বীণার ছিঁড়ে গেছে তার
ভেঙে গেছে মন প্রাণ।
ওগো প্রিয়তমা তোমার কাছে
আমার শেষ মিনতি।
জীবন দিতে না পারো
সমাধির পরে দিও বাতি।
মোর সমাধি পরে
ফুটিবে যখন নতুন কোন ফুল।
আঁচলে করিয়া তুলিয়া নিও,
করিও না কভু ভুল।
তোমার ছোঁয়ার পরশমনি,
সোনার চেয়েও দামী।
সুখের লাগি তারই মাঝে
হারিয়ে গেছি "আমি"।

তুমি যে মোর ভবিষ্যৎ

মহঃ সরিফুল ইসলাম

(বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

গোলাপের মত ফুটে উঠে
দেখা দিয়ে ছিলে তুমি।
তোমার বাহার বাতাসে দুরিয়ে
হৃদয়ে দিয়ে যায় আনন্দ ভরিয়ে।
রেখে যাব স্মরণে চিরদিন
তোমার আচরণ ও ব্যবহারের গুণ।
সবার শীর্ষে থাকবে তুমি
যতদিন রাখব চক্ষু খুলি।
তোমাকে স্মরণ করে দিনরাত
গড়ি কর্মজীবনে নতুন ভবিষ্যত।
পড়তে বসে স্মরণ করি
পরাগ ভরা হাসি মুখখানি।
তোমার মুখের কাজল নয়ন
হৃদয়ে ভেসে থাকো সারাক্ষণ।
অন্যেরা যেটিতে ব্যর্থ হয়ে যায়
তুমি সেটিতে করেছ জয়।
তোমাকে রেখেছি হৃদয়ের মাঝে
সারাক্ষণ থাকবে আমার পাশে।
জয় করবো তোমাকে নিয়ে
বাঁধা বিপদ বিসর্জন দিয়ে।
চলে যেওনা আমাকে এড়িয়ে
অন্যায় থাকলে দিয়ো বুঝিয়ে।
যদি তুমি চলে যাও পাশ ছেড়ে
সত্য তাহলে থাকবে ব্যর্থ হয়ে।
তাই আমি রেখেছি তোমাকে স্মরণেতে
পাশে রাখবো নতুন ভবিষ্যতে।

আজ-কাল-পরশু

আশিষ বিশ্বাস

(অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ভাঙ্গড় কলেজ)

আজ আর এস না তুমি,
কেননা, আজইতো ভেঙ্গে গেল জীবনের ছোট বড় বাঁধ
না, কালও আর এস না তুমি,
কেননা, কালইতো মুছে যাবে ভালবাসার অস্ফুট সাধ,
তুমি বরং পরশু এস,
পেয়ে যাবে ঠিকই অন্য কোন ঝলসানো চাঁদ।।

তালের বড়া

কারিমা খাতুন

(বি.এ., সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

তালের বড়া মিষ্টি ছাড়া
বলছি আমি শোন সবাই
বারো মাসের তেরো পার্বণ
শীত গ্রীষ্ম যখন যেমন
ছয় ঋতুতে হচ্ছে করা
ভাদ্র মাসের তালের বড়া
মা ঠাকুমার হাতে গড়া
তাল খুলে চাল নারকেল বেটে
ঠিক ঠিক মত মিষ্টি ঘেটে
তেলে ভেজে মচ মচ করা
দারুন খেতে তালের বড়া।

আগামী পৃথিবী

দশরথ হালদার

(অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভাঙ্গড় কলেজ)

আগামী পৃথিবী যেদিন তোমার সামনে দাঁড়াবে
সেদিন কী উত্তর দেবে? ভেবেছো কি?
আগামী পৃথিবী যেদিন তোমার কাছে ভিক্ষা চাইবে
সেদিন কী ভিক্ষা দেবে? ভেবেছো কি?
আগামী পৃথিবী যেদিন প্রত্যাশার দাবি নিয়ে হাজির হবে
সেদিন কী দিয়ে প্রত্যাশা পুরণ করবে? ভেবেছো কি?
আগামী পৃথিবী যেদিন অসহায়ভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করবে
সেদিন কীভাবে আশ্রয় দেবে? ভেবেছো কি?
আগামী পৃথিবী যেদিন নিরাপত্তার দাবি নিয়ে হাজির হবে
সেদিন কীভাবে রক্ষা করবে তাকে? ভেবেছো কি?
আগামী পৃথিবী যেদিন অতল অন্ধকারে ডুব দেবে
সেদিন কীভাবে তাকে আলোয় আনবে? ভেবেছো কি?
ভাবো। একবার হলেও ভাবো।
অন্তত একবার।
নইলে,
ধ্বংস হয়ে যাবে তোমার স্বপ্ন;
অপূর্ণ রয়ে যাবে তোমার আকাঙ্ক্ষা,
আগামী পৃথিবীর সঙ্গে তুমিও অতল গহ্বরে ডুব দেবে।

সৃষ্টির কাছে পত্র

শম্পা মুখার্জী
(বি.এ. সধারণ, প্রথম বর্ষ)

'সৃষ্টি'
তোমাকে তো আমরাই করলাম সৃষ্টি,
তুমি পেয়েছ আমাদের বহু দান,
তাই বেড়েছে তোমার সম্মান,
নির্জীব তুমি, তবু মানুষেরই মত
তোমারই মধ্যে আছে অলংকার শত।
'সৃষ্টি' তোমার করেছি বড়োই মাতোয়ারা,
শ্রেষ্ঠ তারাই তোমায় সাজিয়েছে যারা।
নাও তুমি মোদের আর্শীবাদ;
প্রথম প্রবেশে তুমি করেছিলে আর্তনাদ।
সৃষ্টি তুমি কার?
এই ভেবে তুমি হয়োনা ছাড়খার।
সৃষ্টি তোমায় জানাই প্রীতি।
তুমি জীবনের পথে নিয়ে বহো আমাদের স্মৃতি।
এই জানিয়েই শেষ করেছি চিঠি,
তোমার জীবনে যেন নাহি ঘটে অবনতি।

ভূত নিয়ে গবেষণা

বাপি কুমার সর্দার
(বি.এ., সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

ভূত নিয়ে গবেষণা
করে ছিলো রঙ্গ
সেন তার পদবিটা
বাস তার বঙ্গ।
কোন ভূত ভালো বেশি
কোন ভূতে খামচায়
মেছো ভূত কেন রাতে
মাছ ধরে গামছায়।
কোন দেশে ভূত সব।
ডিম পারে দুইবার
সাধ করে ভূত নিয়ে
করবে যে কারবার।
গবেষণা হলে শেষ
ভাঙে সব ভুলরে
ভূত বলে কিছু নেই
মারে সব গুলরে।

পরিচয়

মহঃ আয়ুব আলি মোল্লা
(বি.এস.সি. সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

আমার নাম জানবার পর
বিকালের মত মৃদু হয়ে এল সে
কিছু পরে পার্কে আলো জ্বললো।
আগে কিছু পরে জ্বলে ভালো চাঁদ
তার বাড়ি ফেরার পথে চুপি চুপি
চেয়ে থাকে লাল নক্ষত্রেরা
অনেক নক্ষত্র পেরিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো
আমাদের মাথার উপর যে আকাশ
আকাশে বিছিয়ে আছে যে অন্ধকার
ঘুমের মতো নিবিড় দুটি চোখ
এবং
ঘুমে ভেঙে যাবার মত একখানি মুখ।

সোনালী স্বপ্ন

স্বপন মণ্ডল
(বি.এ. সাধারণ, তৃতীয় বর্ষ)

স্বপ্ন ছিল মনেতে
গড়ব নতুন দেশ।
নতুন দেশে নতুন বেশে
ঘুরব সারাক্ষণ।
উজ্জ্বল আকাশে নবধ্রুব তারার মত
থাকব চেয়ে সবার পানে।
স্বপ্ন ছিল সবুজ গানে
সোনালী ফসল ফলাই।
সোনালী ফসল তুলব মোরা
ভরাব কত লক্ষ্মী গোলা।
স্বপ্ন আমার ছিল মনে
শূন্যপথে, পুষ্প রথে
যাব অচিন দেশে।
অচেনাকে চিনব মোরা
জানব অজানাকে।

অরণ্য বাঁচাও

প্রসেনজিৎ মণ্ডল
(বি.এ. সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

অরণ্য অরণ্য করছি আমরা,
অরণ্য দেশে আছে কি আর।
অরণ্য আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে,
কাটছি আমরা নিরবিকার।
তাই এসো আমরা শপথ করি,
অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখি।
অরণ্য সপ্তাহ পালন করি,
প্রত্যেকে আমরা গাছ গড়ি।
অরণ্যই আমাদের জীবন-মরণ,
অরণ্যই আমাদের আত্মীয়-স্বজন
অরণ্য ছাড়া বাঁচবোনা আর,
অরণ্যকে গোড়াবো আবার।

কবি গুরু

সানজিরা খানম
(বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

কবি গুরু রবি ঠাকুর
জন্মে ছিলেন এই দেশে,
এই মাটিকে ধন্য করেছেন
কবিতাকে ভালোবেসে।
বাল্যকালে পেয়েছেন
আদর ও ভালবাসা,
বড় হয়ে দেখালেন
তার কত ভাষা।
তারই জন্য গর্বিত আজ
আমরা ভারতবাসি।
তাইতো আমরা কবি গুরুকে
এত ভালবাসি।

অবুঝ মন

তাপসী বাগ
(*বি.এ., সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ*)

অবুঝ মনের সবুজ ব্যথা বোঝে না তো কেউ
কেউ বুঝতে চায় না প্রতিদিন নদীতে কেন ওঠে ঢেউ।
মন যার অবুঝ তাকে কে বোঝাবে
অবুঝ মন তাই ঠিকানা খুঁজে যাবে।
পাক বা না পাক সে কোন ঠিকানা
তবুও সে ছুটে চলে পাগলের মতো দিশাহারা।
মন বড়ো অবুঝ তাই যখন তখন বোঝানো যায় না
পাগল পারা দিশাহারা চোখ দিয়ে ঝরে কান্না।
মনতো অবুঝ তাই সে কিছুই মানে না।
মন চায় অনেক কিছু যা পাওয়া যায় না।
সে চায় নতুন কিছু তাকে কেউ বোঝে না।
তবুও মনের চাওয়া হয় না কভু শেষ
কখনো কখনো মানে না কোন নীতি আবেশ।
হয়তো মন স্বপ্ন দেখে অনেক আশা নিয়ে
অনেক স্বপ্ন ভেঙে যায় মনকে হতাশ করে দিয়ে।
স্বপ্ন না সত্যি হলেও মন ছাড়ে না কভু আশা
মনতো অবুঝ তাই চায় সে সবার ভালোবাসা।
মনের খাতায় সবার থাকে অনেক রঙিন স্বপ্ন
তাই মন কিছু পাওয়ার আশায় সব সময় থাকে মগ্ন।

আমাদের দেশ

গৌতম চৌধুরী
(*বি.এ., সাধারণ, দ্বিতীয় বর্ষ*)

আমাদের দেশে আছে সেই ছেলে কত,
সুযোগ পেলে তারা ভাল ছেলে হত।
বেকার বসে আছে কোন কাজ নাই
মস্তানী করে ভাবে যদি কিছু পাই।
চায়ের দোকানে নয়তো কোথাও কোন রকে,
দিন রাত আড্ডাদেয় সিগারেট ফোকে।
কর্মে অলস হলেও বাক্যে বাহাদুর
কমাণ্ডো কমাণ্ডো বলে মনে ভাঁজে সুর।
সিনেমা দেখিতে ওরা বড় ভালবাসে
খাবার সময় হলে ঠিক ঘরে আসে।
ঢেউ তোলা চুলগুলো এলোমেলো করা
শটকাট ফিট-ফাট চোঙা প্যান্ট পরা।
দাঁড়িয়েই থাকে সে যে বসা বড় দায়
বসিতে গেলেই যদি প্যান্ট ফেটে যায়।
নিজেকে বাঁচাতে ওরা বড় সচেতন
বিপদ আসলে ওরা করে পলায়ন।

ভুলে যেতে চাই

অপরাজিতা চক্রবর্তী
(*বি.এ., সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ*)

তোমাকে ভুলে যেতে চাই,
ভুলে যেতে চাই তোমাকে।
ভুলতে চাই তোমার পাগল করা হাসিকে
যার মধ্যে ছিল শুধু মন ভোলানো আবেগ।
ভুলে যেতে চাই তোমার ছেলে মানুষীকে।
যার মধ্যে ছিলো শুধু ন্যাকামী।
ভুলতে চাই তোমার বন্ধুত্বকে
যার মধ্যে ছিলো শুধুই স্বার্থ।।

ভুলে যেতে চাই সেই গোধূলীকে
যখন ভোরের উজ্জ্বল উষা
সকালে মিষ্টি আলো বিকিরণ করে
দুপুরে চারিদিক আলোকিত রেখে
পড়ন্ত বিকেলে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলো
ঠিক সেই সময়ের মিথ্যে আবেদনকে।।

যে কথা কোনদিন কোন সময়ে
বলেছিলে শুধু চোখের ভাষায়
ভুলে যেতে চাই সেই বানানো ভাষাকে।
ভুলে যেতে চাই একটি উত্তরের আশায়
তোমার চাতকের মতো তাকিয়ে থাকার দৃশ্যকে
ভুলে যেতে চাই তোমার অভিনয়কে।
ভুলে যেতে চাই তোমার সেকি ভালোবাসাকে।

সম্পর্ক

নীতা চৌধুরী
(*বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ*)

আমি যদি হেসে বলি
তুমি ভালো থেকো।
বলতো লোকে তোমার আমার
এমনকি সম্পর্ক।
একটু ভেবে দেখলে বুঝবে
কেউ কারোর নয়।
সবাই আমরা এসেছি
এখানে করতে অভিনয়।
কেউ হবে বাবা-মা
কেউ হবে ভাই-বোন,
কেউ বা হবে প্রেমিক-প্রেমিকা
না জানি আছে আরও
আত্মীয় স্বজন।
সুখের দিনে সুখ ভোগ করতে
হাত বাড়িয়ে দেবে।
দুঃখের দিনে যাওনা কাছে
মুখ ফিরিয়ে নেবে।
সত্যিকারের সম্পর্কের
এটাই পরিচয়
এই পৃথিবীর বুকে
কেউ কারোর নয়।

কে তুমি

আলাউদ্দিন আল্ আজাদ
(বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

বিদ্যাতীর্থ ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়,
মৌন কেন আজ তোমার হৃদয়।
দুরদুরান্ত থেকে কত পড়ুয়ারা,
আসে তোমার আঙিনায়।
বিদ্যা-অর্জন করে তারা,
আবার ফিরে যায় বাসায়।
আসেন কত অধ্যাপক অধ্যাপিকা,
রেখে যান কত স্মৃতি হেথা।
তোমার অট্টালিকা ক'রে তোলে সশব্দ
কিন্তু কেন তুমি নিস্তব্ধ।
মুখ যেন বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি,
শিল্পকলায় যেন এক মহাকবি।
দৃষ্টিতে ত্রাসের ইঙ্গিত,
গেয়ে চলেছো যেন বিরহের সঙ্গীত।
আমি হলাম প্রথম বর্ষের এক নগণ্য ছাত্র,
দেখিতে চায় প্রাণ তোমার উজ্জ্বল নেত্র।
গমনে তোমার ভীষণ দুর্বলতা,
আবছা আলোয় কে তুমি অপরিচিতা!

সুনামী

মহিউদ্দিন মোল্লা
(বি.এ., সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

বাড়তো না চারিদিকে
যদি না করতে গ্রাম
লক্ষ লক্ষ প্রাণ এক নিমিষে
প্রমাণ করলে তুমি
হতে পার কত ভয়ঙ্কর
মানুষ মারার তুমি
উল্লেখ্য কারিগর।
তুমি আপনজনকে
করেছো পর
প্রমাণ করেছো তুমি
দেবতারও ওপর।
তোমার স্নিগ্ধতা দেখে
কখনো যায় না বোঝা
কিভাবে হতে পার তুমি
দয়া-মায়া শূন্য নিষ্ঠুরতা
তুমি বুক ফুলিয়ে বললে
ওহে মানুষ ভাই
সবার উপরে প্রকৃতি সত্য
তার উপরে নাই।

খুঁজি তোমায়

সাহিনা পরভিন
(বি.এ. সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

দেখিনি তোমায় আজও
বলা যায় দেখার সাধ্য নাই আমার
তবু তুমি আছ আমার হৃদয় জুড়ে
আমার দেহের প্রতিটি কণায় মনপ্রাণ ঘিরে
শিশির ভেজা স্বর্ণালী সেই দুর্বাঘাসের ছায়ায়
বৃষ্টিস্নাত সবুজের সেই কচি ডগায়
তোমায় অনুভব করি বৃষ্টির রিমঝিম ছন্দে
পাখিদের সু-মধুর গানে।
ফুলের মত যে সুন্দর তুমি
রেখেছি তোমায় হৃদয় মাঝে আমি
তোমাকে খুঁজি পাই সমুদ্র সৈকতে
তোমাকে খুঁজে পাই অপরূপ গোধুলিতে
তোমার কথা মনে হলে
হৃদয় মনপ্রাণ উঠে দোলে
তোমাকে খুঁজে পাই আকাশের দূর নীলিমায়
আমি শুধু জানি যে তুমি আমার
তোমাকে শুধু জানি যে তুমি আমার
তোমাকে দেখি অসংখ্য সুন্দর ফুলের সাজে
তোমার অস্তিত্ব আছে। আমার হৃদয় মাঝে।
দোহাই তোমায় আমায় রেখে চিরদিন
কখনও করোনা তুমি আমায় সঙ্গী বিহীন।

বন্ধু

সুমন নস্কর
(বি.এ., সাধারণ, দ্বিতীয় বর্ষ)

বন্ধু আমার জীবন,
বন্ধু আমার প্রাণ
বন্ধু আমায় দিয়েছে,
নবজীবন দান।
বন্ধু তুমি আছো
মোর হৃদয়ে স্বপনে
কবে তুমি আসবে,
আমার এ জীবনে?
বিরহ আর বেদনায়
ভরা এই দুনিয়ায়
বিহুল করে মোরে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
কবে তুমি আসবে,
আমার এ জীবনে?
কবে ফোটাবে ফুল
এ শুকনো মরুপ্রান্তে।

বিবর্ণ স্বাধীনতা

সুজয় মণ্ডল
(বি.এ., সাধারণ, প্রথম বর্ষ)

হু! স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা।
পেয়ে গেছি আজ স্বাধীনতা!
৬০টি বছর পার হয়ে তবুও
ঘোচেনি আমাদের বেকারত্বের দুর্দশা।
রাজনীতির কোলাহল নির্বাসিত হয় কত নবীন প্রাণ
রাজনীতির কাছে জীবনের নেই কোন দাম।
নিয়ে অত্যাচার আর লোভ লালসার ছুরি।
সবাই যেন করছে আজ স্বার্থকে কাড়াকুড়ি।
চাই চাই আরোও চাই
ন্যায়-নীতির নেই কোন ঠাঁই।
আজও চলে ক্ষমতা দখলের লড়াই।
বলি হয় কত তাজা তরুণ প্রাণ।
এরই নাম কি স্বাধীনতা?
ফুল হয়ে ঝরে পড়ে মানবিকতা।
নিভে যায় দীপ্তির মূল্যবোধ।
ভালবাসা ভেসে চলে কোন অজানা স্রোতে।
নবীন প্রাণে না পাওয়ার করুন চিৎকার,
শুধু দেখি নেই, নেই কিছু নেই তবু আছে
না পাওয়ার বেদনায় হতাশায় ব্যর্থতার গভীর অন্ধকারে
তাই হয় যেতে।
বেকার জীবনে নেই কোন আশা
নেই প্রেম, নেই ভালোবাসা।
লোভ আর লালসার শিকার এরা
তাইতো জীবন বৃথা স্বপ্ন আঁকা।
ভ্রাম্যমান ?? দাম হয়ে
খুঁজে ফেরে পূর্ণ স্বাধীনতা।
অব্যক্ত যন্ত্রণায় এরা আজ মৃতপ্রায়,
জানেনা জীবনের কোন মানে,
পথের ঠিকানা হারিয়েছে কোন খানে।
তৃপ্তি স্বাধীনতা হল আজ অবলুপ্তি
মুখোসের আড়ালে ঘটে চলে কতশত কীর্তি।
তবুও অন্ধত্বের ক্লান্ত আশা অবিরাম জাগে নিদ্রাহীন,
আসবে বৈকি ফিরে আবার সেই মধুর সুদিন?

শতবর্ষ পরে

বিশ্বজিৎ কবি
(বি.এ. প্রথম বর্ষ)

"জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে
ঝাঁপিয়ে পড়িল এক তারা।"
"তারকার আত্মহত্যা" (সন্ধ্যা সঙ্গীত)
রবীন্দ্রনাথ।
এই বাংলার কোন এক অন্ধকার রাতে
কক্ষচ্যুত নক্ষত্র এক ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল।
তবে আত্মহত্যা নয়।
জ্যোতিষ্কলোক হতে দীপশিখা হয়ে ঘরে ঘরে
আলো জ্বেলে ছিল।
উত্তরসুরী মোরা তার,
পেয়েছি কি অনির্বাণ জ্যোতি?
স্মরণে মননে কী পেলাম?
পেলাম কী ভূমার সন্ধান?
"ভূমৈব সুখম্ নামে সুখমস্তি?"
রবীঠাকুর! শতবর্ষ পরে তোমার কবিতা পড়ে
সেদিনের আনন্দ অভিবাদন নিয়েছি কি
সাগ্রহ হৃদয়ে?
কোথায় তোমার সেই জনগণ মন অধিনায়ক?
কী হল আজ পাঞ্জাব-সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবির উৎকল আর বঙ্গের?
পশ্চিমের দ্বার খুলে পূবের মিতালি কতখানি হল?
সেদিন প্রভাতে নূতন তপনের নূতন জীবন
বপন হয়েছে কি?
তোমার কাছে সে শুধু ছিল না কাহিনী,
ছিল না স্বপ্ন।
শ্বাশত সত্য ছিল সেই চেতবাণী।
কোথায় তোমার সেই সোনার বালা?
ধ্বনি দুর্জয় আহ্বানে জাগাতে চেয়েছিল,
কোথায় সেই বজ্রনাদ?
হে কবি! আবার স্মরণ করি।
তোমার কথা নয়, সঙ্গীত নয়,
নয় নয় তোমার বাণী—
শুধু আর একবার এসো।
স্বর্গের চেয়ে মাটির পৃথিবীকে তুমি
দিয়েছ যে প্রণাম,
যে পৃথিবীর মাটির ফোঁটার তিলক পরে
তুমি চেয়েছিলে
এ পৃথিবীর একান্ত আপন হতে।
তোমার চিরদিনের সেই আমি
আবার আসুক আমাদের মাঝে
ভালবাসা নিয়ে,
নিয়ে মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস।

রাখবে কি মনে

ভাস্কর সর্দার
(বি.এ., সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

আমায় রাখবে কি মনে? যেদিন
তোমাদের হাত ছানিদেব, আমি পাড়ি দেব
সুদূর নীলাকাশে।
তারা হয়ে চেয়েরব তোমাদের দিকে
হয়তো বুঝিবে না সে-ডাকের মানে
তবু আমায় রাখিবে কি মনে?
পড়বে কি মনে বেসুর সে গান
হৈ চৈ করা আমাদের সে সভার তান
সে সভা ভেঙে গেছে; তানপুরায়
ধূলা জমেছে
তবু আমায় রাখিবে কি মনে?
শুনিয়ে ছিলেম কবিতা
হয়তো বোঝেনি সে কবিতার মানে
নয়তো চাওনি বুঝিতে সেদিন
তবুও আমি ব্যথা ভরা হৃদয়ে
শুনিয়ে ছিলেম কবিতা।
আজকে আর কবিতা লিখিনে
গান গাইবে
তবুও আমায় রাখবে কি মনে?
হয়তো অজান্তে ব্যাথা দিয়েছি মনে
যদিবা আঘাত করে থাকি আবেগের বসে
ক্ষমা করে দিয়ো মোরে।
যদি না কর ক্ষমা জ্বলিব না আমি
অশ্রু দিয়ে ঢেকে দেব আমার জ্যোতি
বিরহ বেলায় জগতের পরে অন্তর কোণে
তবুও আমায় রাখবে কি মনে?
তোমার সুখে তোমাদের সাফল্যে
মুছবো সে অশ্রু
হয়তো সে অশ্রু তোমায় না পাওয়ার
তুমি দেখতে পাবে না কিছুই।
আঙিনায় এসে গেছি ভালোবেসে
তবুও পড়েনি সাড়া সে দরজায়।
আজিকে আর হবনা তার
পথের শতেক কাঁটা
আমি হাতছানি দিয়ে বিদায় জানাব
ভালোবেসে যান নিরবে— তুমি বুঝিবে না
সে কবিতার মানে—গানের মানে
বুঝবে আমার জগতের লোক
তবু অঝোর নয়নে বুকে পাথর চেপে
শোনাব না আমার মনের ভাষা।
সে ভাষার রূপ বদলে যাবে
তাতে অনেক অলঙ্কার চড়বে
তবু আমায় পড়বে কি মনে?
আমায় রাখবে কি মনে?

Life

Ayan Pal
[B.A. (Hons), First Year]

Life means ceremonies
It means ambition
An aimless life is a horse without a harness
Life is about promises,
No doubt the theme of existence is ambiguous.

Life is a stormy sea,
Or sometimes the calm sea.
Sometime life is busy with adventures,
There is sorrow time and again.
The waves and the tide rise time and again.

When there is a storm,
The life becomes difficult to lead
When it is calm and cool,
Its desirable.

Man has to bear with all
Life has its mysteries.
Man is mortal
But the work of man is immortal.

Fortune

Debmalya Pal
[B.A. (Hons), First Year]

You may love me or not but
Let me not tell to forget you.
Till the time I can breath.
I shall be loving you.

I never render you to make
Love with me, for I.
Adore you unconditionally.
I know either the shame
Forbid you or you have been betrayed
That keep away from love.
But by my eternal love
I shall conqure you then
You must love me.

Hasten the time will came
When you know my love
and improve my fortune.

The Love

Ruksana Parvin
[B.A. (Hons), Bengli Roll-2]

Love is nothing.
But a game of words
The essence of life
It speaks even of unspoken emotions
Love is sometimes like the pain felt
by the caged bird

In this mechanical world
It is love that can sustain us
When a pain rises in the heart,
Love is the only answer.

ছোটগল্প

শেষ ঠিকানা

তৈয়েবুর রহমান
(বি.এ. প্রথম বর্ষ)

পৃথিবীতে কয় জন ভালোবেসেছে? পরিসংখ্যানের হিসাবে তা কখনো মেলানো যায়নি। কত নদী, পাহাড়, রাস্তা ও শহরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনকি অসীম পৃথিবীর কত ক্ষুদ্র বাসস্থানে এই তুচ্ছ মানবজাতি তাদের প্রনাশহীন ভালোবাসার ঠিকনাকে লুকিয়ে রেখে চির বিদায় নিয়েছে তারও কোন সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। এমনি এক তুচ্ছ দুজনের প্রেম আমাকে আশ্চর্য্য করে তুলেছে।

বিজয় নামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। শৈশবে বাবা মারা যাওয়ায় কাকার কাছে মানুষ হয়। কাকারও কোন সন্তান ছিল না তাই বিজয়কে নিয়ে তার কাকা নানা স্বপ্ন দেখতে থাকে। বিজয়কে মানুষের মত মানুষ করাই ছিল তার কাকার পণ। সেজন্য বিজয়কে সংসারের থেকে দূরে সরিয়ে রেখে পড়াশুনায় আরো সুযোগ ছিল কিন্তু অপর দিকে বিজয়ের কাকার এই সিদ্ধান্ত কাকীমাকে অসহ্য করে তুলেছিল। বিজয় তার মেধা দিয়ে কাকীর অসহ্য যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে বিজয় সকলের কাছে মেধাবী হয়ে উঠেছিল। মাধ্যমিক পাশ করে শিবনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। স্কুলের ঠিক প্রথম দিনে জীবনের এক রহস্যময় ঘটনার সূত্রপাত ঘটল। ক্লাসরুমে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে পিছন থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠ তার কানে এলো। পিছনে তাকিয়ে দেখল একজন যুবতী নারী (বিজয়ের থেকে বছর দুই ছোট) তাকে উদ্দেশ্য করেই আসছে। মেয়েটির যেমনি তার রূপ তেমনি তার সুঠাম গঠন ও মিষ্টি মুখখানা নিমেষের মধ্যে বিজয়ের মনকে কোমল করে তুলেছিল। মেয়েটি এসে বলল, যে আজকে স্কুল বসবে না। তুমি ফিরে যাও। বিজয় এক রকম তাকে ভালোবেসেই তার আদেশকে মেনে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু বিজয়ের সাহস হল না, যে কে তুমি? কেন ফিরে যাব—কারণ বিজয় প্রথম থেকেই ভিতু ছিল। পরদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে বিজয় চমকে উঠল কারণ বিজয় গতকাল স্কুল থেকে ফেরার পরেই শিবনগর উচ্চ বিদ্যালয় বিস্ফোরণে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। প্রকৃতপক্ষে স্কুল ছুটি দিল না—প্রার্থনার সময় ছাত্র সমেত ঘটনাটি ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল, গোয়েন্দা সূত্রে ঘটনাটি ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল, গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়। কিন্তু কারণবশত একটু আগে হয়ে যাওয়ায় প্রথম যে অল্প কজন স্কুলে পৌঁছেছিল তাদের উপর এই বিস্ফোরণে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। বিজয় এখন বুঝতে পারল যে কেন আমাকে বাড়ি ফেরালো। বিজয়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠল— মেয়েটি কে? ঐ কি তার ঠিকানা— একদিকে তার উপর প্রেমের তাড়না অন্যদিকে বিস্ফোরণের প্রতিবাদের হাতছানিতে তাকে খুঁজে বার করাই বিজয়কে অস্থির করে তুলল। কিন্তু কোন দিন বিজয় তার ঠিকনা মেলাতে পারছিল না। পূর্বে বিজয় তাকে দেখে কেবলমাত্র কৈশোরকালের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—কিন্তু এতক্ষণে তার মধ্যে চিরজীবন সঙ্গীর বিস্ফোরণ ঘট। শয়নে, স্বপ্নে এমনকি প্রতিটি মুহূর্তে তার কানে ভেসে ওঠে সেই মিষ্টি সুর বিজয়দার বলে পিঙ্কির ডাক। এমনিকরে তার জীবন অতিবাহিত হয়। এবারে সে কোলকাতার নামি কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাড়ি থেকে বেশ দূরে ছিল কোলকাতা তাছাড়া কাকিমার বিরক্তিকে ঢাকা দিতে কাকার সহানুভূতি বিজয়কে কোলকাতার হোস্টেল থেকে পড়াশুনার বন্দবস্ত হল। একদিন রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সেদিন বিজয় জ্বরে ভুগছে আর অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তখন রাত্রি ১২টা হোস্টেলে বিজয় একা দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছে। প্রথমে ভয় করলেও সেমুহূর্তে একজনকে দরকার সেজন্য খুব কষ্ট করে দরজাটা খুলল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য হারানো সেই পিঙ্কি দাঁড়িয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল, সে বিজয়কে দীর্ঘদিন খোঁজার পর আজ তার হদিস পেল। কিন্তু বিজয়ের মন আনন্দে ভরে গেলেও মাথার যন্ত্রণা তাকে বাক শক্তি পর্যন্ত অস্বাভাবিক করে তুলেছিল। পিঙ্কি সেটা বুঝতে পেরেছিল। তাই মনপ্রাণ দিয়ে তাকে সেবা করতে লাগল। এর ফলে বিজয় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল; আবার এর ফাঁকেই সারা দিনের খাবার প্রস্তুত করে ভোর হতে না হতেই চলে গেল পিঙ্কি। বিজয় ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। পর রাত্রি আবার ১২টার সময় পিঙ্কি আসল এবং তার সেবায় বিজয় একেবারে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু পিঙ্কি কেন বিজয়ের প্রতি এমন সহানুভূতিশীল তা অবশ্য পিঙ্কির কাছে গোপন ছিল। আবার ভোর হতে না হতেই সে চলে গেল এবং বলে গেল কাল বিকাল ৫টার সময় বিজয়গঞ্জের মাঠে দেখা হবে। ঠিক তার পরদিন বিকাল ৫টার সময় বিজয় বিজয়গঞ্জের মাঠে উপস্থিত হল। জায়গাটা ছিল বেশ মনোরম রেল স্টেশনে থেকে দূরে সমুদ্রের ধার বরাবর বৃহৎ মাঠের মধ্যে একটা অশ্বথ গাছের নিচে কোমল ঘাসের উপর জনহীন সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে বিজয় একাকী বিরাজ করছিল। ঠিক ৫টার সময় পিঙ্কি এসে হাজির হল উভয়ের মধ্যে আনন্দের জোয়ার উঠলেও পিঙ্কির মুখে ভয়, বেদনা, পরাধীনতা ও অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। পিঙ্কি কিছুতেই তার মনের কথা বিজয়কে বলতে পারছিল না। বিজয় তার ঠিকানা জানতে চাইলে শুধু পিঙ্কির চোখ দিয়ে মানব হৃদয়ের অজস্র করণার ফোঁটা ঝরে পড়ত এবং সঙ্গে সঙ্গে পিঙ্কি অন্য প্রসঙ্গ তুলে বিজয়ের প্রশ্নকে নিস্তেজ করে

দিত। পিঙ্কির কেবলমাত্র একটাই পরিচয় ছিল তার মোবাইল নাম্বার। ঠিক সূর্য মামার অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে পিঙ্কি বিজয় গঞ্জের মাঠ থেকে বিদায় নিত। এবং প্রতিদিন রাত ১২টার সময় পিঙ্কির আবির্ভাবে বিজয়ের হৃদয়ে সূর্যোদয় হত। ভোরের আগে পর্যন্ত বিজয়ের সেবা ও খাদ্যের সুব্যবস্থা করে পিঙ্কি চলে যেত আবার দেখা হত সেই বিজয়গঞ্জের মাঠে। এইভাবে দুজনে পরস্পরের হৃদয় মিলিয়ে সুখ জ্ঞাপন করেছিল। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন সইল না। বিজয় চাকুরী পেল কোলকাতারই একটা জায়গায়—ফলে বিজয় পিঙ্কির ঘনিষ্ঠতায় বাধা পড়ল। এখন সে আর হোস্টেলে থাকে না চাকুরীর কোয়ার্টারেই থাকে। সেদিন সকাল বেলা বিজয় ফোনের রিসিভার তুলে পিঙ্কির কথা জানতে পারল। সে বিজয়কে একটা বার অনুরোধ করছিল যে, সে একটিবার তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। পিঙ্কি প্রতিদিন সেই বিজয়গঞ্জের মাঠে আসত তাও জানতে পারে বিজয়। কিন্তু পিঙ্কির প্রতিবন্ধকতায় বিজয়ের সঙ্গে চাকুরীস্থানের জনসমাজের পিঙ্কির দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে ছিল। তাই পিঙ্কির সাথে বিজয়ের যেন বন্ধন হিসাবে কাজ করত সেই মোবাইল। বিজয় পিঙ্কির সাথে দেখা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল তাই সে কিছুদিনের জন্য ছুটি চাইল, কিন্তু চাকুরী থেকে তাকে ঐ মুহূর্তে মুক্তি দিল না। সেজন্য চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ঠিক বিকাল ৪টার সময় সেই বিজয়গঞ্জের মাঠে উপস্থিত হল। পিঙ্কিকে সেই অশ্বথতলায় কালবৈশাখী মেঘের মত মুখরত অবস্থায় তাকে দেখতে পেল। বিজয়ের আগমনে সেই কালবৈশাখী মেঘ বিনাবাধায় চোখ দিয়ে বৃষ্টি ন্যায় নামতে শুরু করল। পিঙ্কি বিজয়ের কাছে আশ্রয় চাইল—হয় আমাকে নিয়ে তোমার বাড়ি চল অথবা কোন ঠিকানাহীন স্থানে নিয়ে চলো, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে আমাকে একটু আশ্রয় দাও। আমি আর এভাবে বাঁচতে চাই না। কিন্তু কি হয়েছে, কি তোমার সমস্যা কিছুতেই বলতে চায় না—শুধু আশ্বাস দেয়, পরে সব বলব, বিজয় তাকে শুধু ভালোবাসে না, মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। আজকাল শুধু ভালোবাসে রূপ আর টাকার মোহে। যে ছেলে গরীব সে ধনী লোকের মেয়েকে ভালোবাসতে চায়। আবার যে গরীব মেয়ে সেও ধনী লোকের ছেলেকে বর হিসাবে পেতে চায়। ফলে উভয়ের ভালোবাসা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। উভয়েই ভালোবাসাকে খেলার পুতুল হিসাবে মনে করে—আজ একজনকে, পরদিন অন্য একজনকে ভালোবাসে। আর যদিও উভয়ের হৃদয় বন্ধন মিলিত হয় পূর্বমনকামনা বিয়ের পরে বিষ হয়ে দেখা দেয়—তারা সুখী হয় না। কিন্তু বিজয় সেটা করতে পারে না, তাই কাকীর সম্পর্কে তার ভয় থাকলেও সমস্ত জড়তাকে কাটিয়ে বিজয় পিঙ্কিকে নিয়ে কাকার বাড়ি হাজির হয়। কাকা সেদিন বিজয়ের জন্য ভালো পাত্রীর খোঁজে বেরিয়েছিল। কাকী যখন জানতে পারল সে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। তার উপর পরিচয়হীন কাকীমার মধ্যে বিষক্রিয়ার সঞ্চার হয়। পর কী কখনো আপন হয়? ফলে কাকীর বাড়ি তাদের আশ্রয় মিললো না। এমনকি চিরদিনের জন্য তাদের কাকীর বাড়ির দরজা বন্ধ তাও বলে দেয়। বিজয় এই মুহূর্তে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। এমন সময় চারজন যুবক মারুতি করে এসে পিঙ্কিকে তুলে নিয়ে গেল। ঠিক এর আগের মুহূর্তে বিজয়ের কাছে তার সেই গোপন ঠিকানাটি একটা কাগজের খামে জুড়ে দিয়ে গেল, কিন্তু একটা শর্ত সাপেক্ষে। শর্তটা হল—বিজয় কোন দিন ঐ চিঠির মোড়কটা খুলতে পারবে না, এমনকি জানতেও চাইবে না। পিঙ্কিকে যখন ধরে নিয়ে যায় তখন বিজয় তাদের বাধা দিতে পারত কিন্তু তাদের কাছে পিস্তল থাকায় সেই মুহূর্তে এমন কিছু সুবিধা করতে পারল না। এর পর বিজয়ের জীবনে নেমে এল—অসহায়ের ডাক ও পরম সঙ্গীকে হারানোর অনুতাপ। এই সময় তার একটা কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়ে উঠল। বিজয় খুব মেধাবী ছিল তাই চাকুরী-পরীক্ষায় প্রথম হত। কিন্তু পূর্বে চাকুরী নিজ ইচ্ছায় ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে পিঙ্কির ঠিকানা পড়েই তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করত। বিজয়ের জীবনে সমস্ত রকম দুর্ভিক্ষ তাকে আক্রমণ করল। দিনের পর দিন বিজয় পাগলের মতো গাছের তলায়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটাত। কিন্তু পিঙ্কির প্রতি অতি ভালোবাসায় সে কখনো ঠিকানার খাম খুলতে সাহস পেল না। পিঙ্কির সাথে মোবাইলে ও কোন কথা বলার সুযোগ পেল না, হয়তো তারা মোবাইলকে গ্রাস করেছে অথবা আপনজনকে বিপদের কথা ভেবে পিঙ্কি সেটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিতে কোলকাতার এক হোটেল মালিক হোটেলের কর্মচারী হিসাবে আশ্রয় দেয়। এখন কিছুটা শান্তি হলেও যৌবনের ভরাডুবি, পিঙ্কির প্রতি অস্বাভাবিক ভালোবাসা, পূর্ব জীবনের স্মৃতিস্বপ্ন, কাকীর প্রতি অভিমান, পিঙ্কির গোপন ঠিকানার রহস্য বিজয়ের এই শান্তির অগ্রগতিকে থমকে দিচ্ছিল। ভালোবাসার অসহ্য যন্ত্রণা সইতে না পেরে একদিন সে ঠিকানার খামটা খুলে রহস্যের বীজকে ধ্বংস করতে উদ্ধ্যত হল। ঠিক একই মুহূর্তে সেই মারুতিটি হোটেলের সামনে এসে থেমে গেল। বিজয় তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার ছক আঁটল কিন্তু যখন দেখল তারা তাকেই অনুসরণ করছে তখন জীবন বাঁচানোর আগে সেখান থেকে পালিয়ে সেই বিজয়গঞ্জের মাঠে সমুদ্রের তীরে অশ্বথ তলায়, নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তরে, সূর্য ডুবু ডুবু ভাব এমনি সময়ে সে সেখানে উপস্থিত হল। এইবার আধ ভয়, আধ আনন্দ, আধ বিস্ময়, আধ অভিমানের সঙ্গে পকেট থেকে খুব যত্নসহকারে ঠিকানায় খামটা বার করল। খামের প্রথম স্তরটি খুলেই দেখতে পেল সেই সুন্দর, মিষ্টি অতি পুরানো মুখখানা। আর দ্বিতীয় স্তর খুলে সমস্ত রহস্যের বীজ পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেই দিগন্ত জোড়া আধরাঙা আকাশ, বাতাস নিস্তব্ধ, নিরব অশ্বত্থ গাছ সবাই যেন ঐ গোপন ঠিকানার দিকে ওঁত পেতে চেয়ে আছে। এমনি মুহূর্তে নিষ্ঠুর বিধাতা কাউকে ক্ষমা করতে পারল না—পিছন থেকে বুলেটেরগুলি এসে বিঁধল বিজয়ের পিঠে, আর অমনি দুরন্ত হাওয়ার বেগে হাত থেকে ঠিকানাটি উঠে সমুদ্রের অসীম জলের অতল তলে তলিয়ে গেল।

ফেরা

কারিমা খাতুন

(বি.এ. এডুকেশন সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

বাসের মধ্যে বসে সব কিছু কেমন যেন ধোঁয়াটে ঘোলাটে লাগছে। বাইরে বৃষ্টির ধারা সুমনার চোখের ধারার থেকে কম বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ আগে এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল সে সি.টি.সি.-তে। তার পাশে ছিল সাবির। তখন অনুরাগে সাবির ছিল সুমনার মন। সে মনে মনে ভালোবাসার উত্তাপ নিচ্ছিল। মালঞ্চ থেকে শিয়ালদা একটা পথ উদ্দ্যোগ আনন্দ নিয়ে প্রতীক্ষার অবসানের জন্যে যেন প্রহর গোনা।

বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ করে। তারপর বেশ ঝরঝর করে হতেই সুমনা গাড়ি থেকে নিচে নেমে এক দৌড়ে একটি দোকানের বারান্দায় আশ্রয় নিল। বেশ ভিড়, তারই মাঝে বিপাশাদি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—"সুমনা এ আমার মামাতো ভাই সাবির। ইউনিভারসিটিতে ইংরাজী অনার্সে ফাইনাল ইয়ার।" প্রথম দেখাতেই ভাল লেগেছিল সাবিরকে। বৃষ্টির রেখায় সেদিন মনের কোনে কোনে আলপনা এঁকেছিল সুমনা। প্রথম দেখাতেই সাবির তার মনের আকাশ বাতাসসহ প্লাবিত করে তুলেছিল। সুমনা তখন বি.এ. বাংলা অনার্সে ভর্তি হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যেত দুজনের। একদিন সাবির তার বন্ধুদের নিয়ে নিক্কোপার্কে আড্ডা দিচ্ছে, এমন সময় সে সুনামাকে দেখতে পেল। নানান জায়গায় ফুল গাছ দেখে বেড়ানো সুমনার একটা 'হবি'। এগিয়ে এসে সাবির ওকে ডেকে নিয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এমনকি সাবির তার বন্ধুদের ছেড়ে সুমনাকে নিয়ে তার পছন্দের ফুলগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। এছাড়া ঠিক সেই সময় এসে সুমনাকে একগোছা রজনীগন্ধা ফুল কিনে দেওয়ার কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করেনি। এবং তার কিছুদিন পর একসময় কিনেও দিয়ে ছিল।

সুমনার বন্ধুভাব ছিল খুব বেশি। তাছাড়া বন্ধুদের ব্যাপারে মেলামেশার ক্ষেত্রেও সে ছিল খুব স্বাভাবিক। তাই ওর বন্ধুর অভাব ছিল না। তবুও মনের মাঝে কোথায় যেন সাবির উঁকি দিয়ে তার সমস্ত হৃদয়কে রাঙিয়ে যেত।

ঘটনাচক্রে ওরা দুজনেই একটি সংঘের সদস্য। সংঘের যে কোনও অনুষ্ঠানে ওদের শুধু দেখাই হত না, দুজনে গুরু দায়িত্বও নিত। একবার সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার কিনতে ওরা কলেজ স্ট্রিটের পাওনিয়ারে চলে গিয়েছিল। সেদিনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল, সাবির ছাতা ধরেছিল সুমনার মাথায়। "তুমিও এসো ছাতার তলায় বৃষ্টিতে ভেজার কোনও মানে হয়। বাইরে ঝম ঝম করে, বৃষ্টি পড়ছে। মনের মধ্যে ওর বাজছে শত শত সুর। এক ছাতার তলায় দুজনে নির্বাক। চোখে ছিল বুঝে নেওয়ার ভাষা, আর ছিল নানা অঙ্গীকার।

একটি অনুষ্ঠানে সফল হওয়াই সংঘে চলছিল রঙের খেলা। সবাই আনন্দে সুমনার মুখে রং মাখিয়ে দিচ্ছে। ও শুধু বলে যাচ্ছে আমার মুখে রং দিও না আমার অ্যালার্জি আছে। কিন্তু ওর কথা কেউই কানে নিচ্ছে না। এই কথাটা সাবিরের কানে যেতেই সে সুমনার সামনে এসে বলল "হাত পাতো" তোমার হাতে একটু রং দিতে পারি তো? ভিড়ের মধ্যে ওই ছোট কথাটার আন্তরিকতার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ছিল সুমনার মনে। এবং সে সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই সব স্মৃতির অংশে কতদিন সুমনার মনকে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। ??বন্ধুরা যখন ওদের নিয়ে গুঞ্জন তুলত ওরা কখনও আপত্তি করেনি বা স্বীকারও করেনি। এই ব্যাপারটা সুমনা খুব উপভোগ করত। আসলে ওদের সম্পর্কটা মনের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসেনি কখনও।

সাবির একদিন হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে সুমনার সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের ছেদ। কিন্তু হঠাৎ একদিন সুমনা দেখলো শিয়ালদার মোড়ে একটি মেয়ের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। ও কাছে যেতেই সাবির বলে উঠল "সুমনা এ আমার বন্ধু সাথী।" আর সাথী তো সুমনার কথা শুনেছো। ওরা তিনজন একটি হোটেলে খেতে গেল। তখন সুমনা দেখল সাথী

যেন তেমন সহজ হতে পারছে না। তাই কাজের নাম করে সুমনা সেদিন ওখানে থেকে চলে এসেছিল। তারপর থেকে সাবির ও সুমনার মধ্যে ফোনে কথা হত। নানা রকম কথার মধ্যে সাথীর কথা ও আলোচনা হত।

এরপর সুমনা ও সাবির তাদের নিজেদের কেরিয়ার গোছাতে তারা দুজনে খুব ব্যস্ততার মধ্যে ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সুমনা সাবিরের ফোন পেল। সাবির বলল "সুমনা তুমি আজ বিকালে অবশ্যই শিয়ালদায় আসবে খুব দরকার আছে। সুমনার মনে খুশির জোয়ার বইছে। এতদিন পরে সাবির তার মনের দরজা খুলবে। সে ভালোবাসার কথা বলবে। সুমনা মনে করল সে এক কথায় রাজি হয়ে যাবে। আজ সুমনার জন্মদিন। তাই কি পরম উপহার বিশেষ দিনে। এই দিন সুমনার বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর দিন। কিন্তু বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হলেও সে সব করার বা ভাবার সময় প্রয়োজন মনে করল না। সে ভাবতে লাগল আজ শুধু সাবির। আজ সে সাবিরকে জীবন সঙ্গী হিসাবে পাবে। সাবিরকে সে তার কাছে পাবে। তার এতদিনের আশা, ভালোবাসা, স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলেছে। তাই সে এই দিনটিতে অন্য কিছু ভাবতে পারল না।

এক অজানা টানে সে অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছে গন্তব্যস্থলে। ট্যাক্সি নিয়ে এসে সাবির বলল "চল রেস্টুরেন্টে"। সুমনার মনের আশাটা আরো বাড়তে লাগল। সে মনে করল নির্জন বাসে তারা তাঁদের মনের কথা বলবে। এমন একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসল যেখানে সর্বদায় প্রেমিক-প্রেমিকার আসা যাওয়া বা মিলনক্ষেত্র। সুমনার মন খুশিতে ভরে গেল। তার পছন্দ করে দেওয়া শার্ট সাবিরের গায়ে। আর একটু পরে প্রতীক্ষার অবসান। সাবির হবে শুধু তার। সারা পথ রাস্তায় দৃশ্যগুলো ভীষণ রোমান্টিক লাগছিল। সাবির গম্ভীর। হয়তো নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। গোপন কথা বলার জন্য। আষাঢ়ের আকাশটা গম্ভীর হয়ে আছে। বৃষ্টি নামবে নামবে ভাব। এর পর কি পুষ্প বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে?

রেষ্টুরেন্টের সামনে সাথীকে দেখে সুমনা যেন একটা ধাক্কা খেল। অবাক হয়ে সাবিরকে আড় চোখে দেখে নিল। তিনজনে ভিতরে গেল। বসার পর সাবির খাবারের অর্ডার দিতেই সাথী বলে উঠল—"আমার তাড়া আছে এখনই ফিরতে হবে।" বারে কিছু না খেয়েই চলে যাবে? সাবির মিষ্টি করে হাসল।

"না যে কাজের জন্য এসেছি সেটা তাড়াতাড়ি সারো?" বলে সাথী সুমনার দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাল। সাবির হাল্কা হওয়ার জন্য বলল "এত তাড়া কেন?" আগে কিছু খাই। তারপর একটু আড্ডা তারপর না হয় হবে। সাথী বিরক্তি ঢাকতে না পেরে ব্যাগটি কাঁধে তুলে উঠে পড়ল। সাবির ওর হাত ধরে বসিয়ে দিল। তারপর সুমনার দিকে ইতস্ততঃ ভাবে তাকিয়ে বলল—"সুমনা সাথীকে বলে দাও যে আমাদের মধ্যে কোন অ্যাফেয়াসর নেই। আমরা জাস্ট বন্ধু। শুধু বন্ধুই। ওর মাথার ভূতটা তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বা ওর সন্দেহ দূর করার জন্য তোমার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন। তাই তোমাকে এভাবে ডেকে আনলাম। সরি সুমনা কিছু মনে করো না।"

এই কথাটা শোনার পর সুমনার যেন সারা পৃথিবী দুলছে। পায়ের তলার মাটি আছে কিনা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। সে যেন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কিছু দেখতে পারছে না। তার সামনে এক গভীর অন্ধকার নেমে এল। এক বিরাট অন্ধকারময় গহ্বর। আলোর খোঁজে সে ছুটে বেরিয়ে এল। অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে সে বাস ধরে নিল ফেরার জন্য। ফেরার পৃথিবী তার কাছে এখন উজ্জ্বল আলোকময়।

বিবেকের ঋণ শোধ

শফিউন্নিসা

(বি.এ. এডুকেশন সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

প্রত্যন্ত এক গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। বছরে দুবার জমিতে চাষ হয়। বাকী সময় তাদের অন্যান্য এলাকায় দিন মজুরী খাটতে হয়। এই গ্রামেরই এক প্রান্তে আনন্দের বাড়ি। দিদি-মা আর আনন্দ এই ছোট্ট সংসার। দিদি তার থেকে চার বছরের বড়। দুঃখের সংসারে পড়াশুনা বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি দিদি। এখন জামা কাপড় সেলাই করে রোজগার করে। নিজের পড়াশুনা বেশী হয়নি তাই ছোট্ট ভাই আনন্দর পড়াশুনায় কোন বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি। দুই ভাইবোনের মধ্যে স্নেহ ভালোলাগার কোন কমতি ছিল না।

হায়ার সেকেন্ডারীর রেজাল্ট বেরোতেই একটা সাড়া পড়ে গেল। নজরকাড়া নাম্বার পেয়ে জেলায় প্রথম হয়েছে আনন্দ। মা-দিদি সবাই খুশিতে আত্মহারা। বাবা নেই আনন্দ সবার চোখের মণি।

গ্রামে কোন ভালো কলেজ ছিল না। তাই তাকে কোলকাতায় যেতে হল। আগের দিন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সবাই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, উপহারও পেয়েছিল প্রচুর। হেড স্যার তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় বলেন। "আনন্দ আমাদের গর্ব, আমাদের গ্রামের গর্ব, স্কুলের গর্ব। আমরা চাই সে একজন বড় ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। মানুষের মত মানুষ হবে।"

গরীবের ছেলে আনন্দ ভালো রেজাল্টের দারুন স্কলারশীপ পেল। লেখাপড়া স্বচ্ছন্দে চলতে লাগল। এক একদিন মনে পড়ে তার গ্রাম্য জীবনের কথা। গ্রামের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা। নদীর দু-কূল জুড়ে সবুজের সমারোহের কথা। মনে পড়ে মা, দিদি, হাফিজ সুজয়ের কথা।

একদিন সে নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। নদীর জল, তাতে শাপলা-শালুকের মিষ্টি হাসি, মাথার উপরে সাদা মেঘের ভেলা তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি ফেরার কথা মনে হল যখন তখন এক আকাশ ভরা তারা তার পথ ঝাপসা করে দিচ্ছিল। বেশ রাতে বাড়ি ফিরে দেখেছিল মা ও দিদি বসে কাঁদছে। তাকে দেখেই দিদি ছুটে এসে বলল "একা একা এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিল? আমরা ভেবে ভেবে মরি। তোর সেই ছোটবেলার স্বভাব এখনও গেল না।

যখন ছোট ছিল, দিদির কাছে প্রতিদিন বায়না ধরত গল্প শোনার। দিদি তাকে কত গল্প শোনাত। রাজপুত্র, রাক্ষস-খোক্কস, লালপরী-নীলপরী আরও কত কি। শুনতে শুনতে তারও মনে হত—হঠাৎ একদিন লালপরী-নীলপরী নদীর ধারে একা পেয়ে তাকে নিয়ে যাবে তাদের দেশে। রাজপুত্রের সাজে সাজিয়ে। অনেক সোনা-মাণিক দিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। মা-দিদি তাকে দেখে অবাগ হয়ে বলবে—"রাজপুত্র, তোমার বাড়ি কোথায়? এখানে কীভাবে এলে?" উত্তরে সে খিলখিল করে হেসে উঠে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলবে—"আমাকে চিনতে পারছ না? দিদি থতমত খেয়ে যাবে। একটু সময় নিয়ে ভালো করে দেখে বলবে "ও, তুই আমাদের আনন্দ। তা এসব কোথায় পেলি?" সে বলবে, " আমার বন্ধু লালপরী আর নীলপরী দিয়েছে।" আর তাদের কোন দুঃখ থাকবে না। কতদিন একা একা সে তাই নদীর ধারে পরীদের আশায় ঘুরেছে। কিন্তু কোনদিন তারা কল্পনা থেকে বাস্তবে নেমে আসেনি।

আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল তার কলেজের বন্ধু রোহিত। রোহিত বলল, "তোর কি হয়েছে বলত আনন্দ? ক'দিন ধরে দেখছি তোর খুব মনমরা ভাব। বাড়িতে কিছু হয়েছে?" আনন্দর বাড়ির কথা রোহিত সব জানতো। আনন্দই তাকে বলেছিল। সে বলল, "না-না, কিছু হয়নি। মাঝে মাঝে দিদির কথা খুব মনে হয়। দিদি বড় হয়ে গেছে, তাকে বিয়ে দিতে হবে। কখনও কখনও তাই ভাবি, পড়াশুনা ছেড়ে একটা চাকরি করে দিদির বিয়েটা দিয়ে দিই। আমাকে পড়ানোর জন্যই দিদির বিয়ের টাকাকড়িও নেই।" রোহিত বলে, ওসব চিন্তা পরে করবি। আগে তোর কেরিয়ার ঠিক করে নে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

মানুষের মন পরিবর্তনশীল। বন্ধু-বান্ধবদের সহচর্যে মানুষের চরিত্রের একটা বড় অংশ গড়ে ওঠে। বন্ধু যদি ভালো হয়, তবে সেও ভালো হয়। আর বন্ধু যদি খারাপ হয়, তবে সেও ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যায়। এর একটা ভালো দৃষ্টান্ত আছে। কামারশালায় যদি বসে থাকা হয়, তাহলে কাপড় না পুড়লেও তার কালি ধোঁয়ায় পোষাক ও গায়ে ময়লা জমবে। অন্যদিকে কোন সুগন্ধি বা আতর বিক্রেতার কাছে বসলে, সুগন্ধি না কিনলেও তার সুবাসটুকু পাওয়া যাবে। দেহ-মন প্রফুল্ল হব।

আনন্দের জীবনেও একটু একটু করে পরিবর্তন আসছে। উদারতার স্থানে ধীরে ধীরে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা গেঁড়ে বসছে। মা দিদির জন্যে এখন আর তেমন একটা চিন্তা হয় না। চিন্তা শুধু কিভাবে সে বড় হবে। অনেক বড়লোক হবে।

ফিজিক্সে মাষ্টার ডিগ্রী করার পরপরই একটা কলেজে পার্ট টাইমারের কাজ পেয়ে গেল। এইসঙ্গে কীভাবে সে বিদেশে

গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে পারবে সে সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিতে লাগল। সুযোগও পেয়ে গেল একদিন। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভালো র‍্যাঙ্ক করেছে। সেখান থেকে বলে পাঠিয়েছে তিন মাসের মধ্যেই সিট বুকিং করতে হবে। চাকরি আর স্কলারশিপ মিলে হাজার পঞ্চাশেক টাকা জোগাড় হয়ে গেল। শুভদিন দেখে বিমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় উড়ান দিল। যাওয়ার আগে মা-দিদিকে ছোট্ট একটা চিঠিতে জানিয়ে গেল "আমি পড়ার জন্যে আমেরিকায় যাচ্ছি। তোমরা কোন চিন্তা করো না। পাঁচ বছর পরেই আমি ফিরে আসব।"

বিদেশে গিয়ে প্রথম প্রথম একটু আনইজি লাগত। ধীরে ধীরে সেটাও কেটে গেল। সেখানেই একদিন দেখা হল এক সুইডিশ সুন্দরী তরুনীর সঙ্গে। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিয়ে করল।

পাঁচ বছর দেখতে দেখতে গেটে গেছো পি.এইচ.ডি. কমপ্লিট হয়েছে। এখন একটা ইউনিভারসিটিতে অধ্যাপনার কাজ করে। গাড়ি, বাড়ি, বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিদেশে বিভুঁয়ে সুখেই জীবন কাটতে লাগল।

দীর্ঘ দশ বছর পর ইন্ডিয়ান রিসার্চ সেন্টারের ডাকে আবার দেশে আসছেন স্যার আনন্দ রায়। দু-তিন দিনের বেশী থাকবে না তাই বেশী লাগেজপত্র নিল না। তার স্ত্রীকেও সে আসতে বলেছিল। কিন্তু তার কি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকার জন্য আসতে পারেনি। সেও এক কলেজের অধ্যাপিকা।

আসার আগে আনন্দ একটা টেলিগ্রাম করল দিদির কাছে। এতদিন কোন খোঁজ নেওয়া হয়নি তাই মনে মনে লজ্জা অনুভব করল। গ্রামের এক দূর সম্পর্কের কাকা উত্তর পাঠাল— "গত দু-বছর আগে এক বন্যায় গ্রামের অনেক লোক মারা যায়। তার মায়ের মৃতদেহ খুঁজে পেলেও দিদির কোন খোঁজ পায়নি।"

দুদিন ভালোভাবেই কাটাল। তৃতীয় দিন একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল আনন্দ। আগের মেসের অবস্থা এখন কেমন জানতে গেল। আসতে আসতে রাস্তার ধারে এক ভিখারীনীকে দেখল। ভিখারীনীটা এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। কাছে যেতেই বলল, বাবু কিছু সাহায্য করুন। তিনদিন কিছু খাইনি।" আনন্দের মনে হল তার দিদি নয়তো! না-না এ তার দিদি হতে যাবে কেন? সঙ্গে আরো দু-জন সঙ্গী ছিল তারা বলল, "এসব ভিখারীগুলোর জ্বালায় একটু নিশ্চিন্তে বেড়ানো যাবে না। চলুন আনন্দ বাবু। তাড়াতাড়ি পা চালান।" আনন্দ নিজের স্ট্যাটাস ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে ভিখারীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই চলে গেল।

আনন্দ নাম শুনেই চমকে উঠেছিল ভিখারীনী। কত বড় হয়েছে তাদের আনন্দ। তাকে হয়ত এঅবস্থায় চিনতে পারলে লজ্জায় পড়তে পারে, তাই সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

আবার আমেরিকায় ফিরে এসেছে ড. আনন্দ রায়। বাড়ি ফিরে মনের মধ্যে অনুভব করল সামান্য এক পীড়ন। তার স্ত্রী এখন আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায় না। ডিভোর্স নিয়ে নিল। লিভ-টুগেদার আইন বৈধ হওয়ায় বিবাহের আর কোন দাম নেই তার সুইডিশ স্ত্রীর কাছে।

আনন্দ দিনদিন একা হয়ে পড়ল। এখন এই একাকীত্বটা বড্ড অনুভব করে। এক পরিচালিকা বাড়ীর সব কাজ-কাম করে। হঠাৎ একদিন ফেরার পথে স্টোক হয় আনন্দর। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে একটা নাসিংহোমে ভর্তি করে দেয় তাকে। সুস্থ হয়ে উঠলেও দুই-পা প্যারালাইসিসের শিকার হয়ে পড়ল। আনন্দ এখন আরও একা। তার মনের সেই পীড়ন ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। অসহ্য সেই বিবেকের পীড়ন রোগ যন্ত্রণার চাইতেও কষ্টদায়ক। ছোটবেলায় সে কবিতা পড়তে ভালোবাসত। আজ এই একাকীত্বের দিনে একটা কবিতা তার বারবার মনে পড়ে—

উদাসীন হে মানুষ,
কখনও ভেব না
অন্যায় করে যাবে তার
কোন বিচার হবে না।
বঞ্চিত সর্বহারা করে
রেখেছো যাদের,
একদিনও তারা জবাব
চাইবে না এর।
সব কিছু থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে
একথাও মনে করো না
বিবেকের কাছে জীবন
সায়াহ্নে একদিন,
নিষ্ঠুর আঘাতে শোধদিতে
হবে সব ঋণ।

শব্দ জব্দ

মহম্মদ মইনুল ইসলাম
(বি.এ., সাম্মানিক বাংলা, দ্বিতীয় বর্ষ)

কৃ	ষ	ক[২]	*	[৩]না	না	[৪]বি	ধ[৫]
শ	*	ল[২]	ণ্ঠ	ন	*	ব[৭]	৯
*	[৮]বা	র	*	ক[৯]	বী[১০]	র	*
ক[১১]	লে	ব	র[১২]	*	না	*	জ[১২]
ক[১৪]	গ	*	হ	*	*	[১৫]বি	র
ম	*	*	[১৬]ম	মু	র[১৭]	*	ড
গ[১৮]	গ[১৯]	*	ও	*	ম	*	ই
নি[২০]	লা	ম	*		নী[২১]	য়	ন

পাশাপাশি ঃ

১. শ্রেষ্ঠ সমাজ কার নাম। ৩. বিভিন্ন প্রকার নানারকম। ৬. "হাতে করে ঠনঠন জোনাকিরা দেয় আলো।" ৭. অরণ্য, জঙ্গল। ১৫. ধী- যোগে জেলে বোঝায়। ৯ ভক্তি আন্দোলনের একজন সাধক, ১১. "—খাটোনয় তিনমন প্রায় ওজন।" ১৪. — ন-আমির খানের একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র। ৮. সপ্তাহের প্রত্যেক দিনকে অন্য বা প্রচলিত ভাষায় যা বলে। ১৬. ভারতের যে পাখি বর্ষাকালে আকাশে মেঘ দেখলে নাচে। ১৮. রেখা/লাইন। ২০. 'দেনা' শোধ না দেওয়ার জন্য জমিজায়গা যে ভাবে ভাগ হয়। ২১. একটি নিস্ক্রিয় মৌলের নাম।

উপর নিচ ঃ

১. হৃত্বিক রোশনের বর্তমান হিট ছবি। ২. হৈ চৈ, চেঁচামেচি। ৩. শিখ ধর্মের প্রবর্তক। ৪. কাঁটাতারের সামসাময়িক একটি সেক্সচ্যুয়াল বাংলা ছবির নাম। ৫. সম্পদ। ৮. বিপরিত শব্দ নাবালেগ ১০. বাদ্যযন্ত্র। ১১. কলম রাখার পাত্র। ১২. কাবুলিওয়ালা ছবিতে নায়কে যে নামে ডাকা হয়। ১৩. বিবর্তনবাদের প্রবর্তক। ১৭. মেয়ে, মহিলা। ১৯. কণ্ঠ।

The Governing Body Members

Manwora Begum
President (Govt. Nominee)

Dr. Pradip Kr. Basu
Principal Secretary

Dr. Dilip Kr. Nandi
Member (University Nominee)

Abdus Sattar Molla
Member (Govt. Nominee)

Sri Mrinal Kanti Bhattacharaya
Member (University Nominee)

Badal Zamaddar
Member (Govt. Nominee)

Smt. Luna Kayal
Member (Teachers' Representative)

Smt. Nanda Ghosh
Member (Teachers' Representative)

Smt. Debjani De
Member (Teachers Repsentative)

Dr. Nirupam Acharyya
Member (Teachers Repsentative)

Abdur Rahim Baidya
Member (Non Teaching Representative)

Sri Bimal Kumar Naskar
Member (Non Teaching Representative)

Moumita Acharya
Member (Students Representative)

TEACHING STAFF

Principal
Dr. Pradip Kumar Basu

✱ **Department of Bengali**
1. Dr. Nirupam Acharyya
2. Dasharath Haldar
3. Ajoy Majhi
4. Jahar Ali Mondal

✱ **Department of Economics**
1. Sanjukta Chakraborty
2. Dr. Tapan Banerjee

✱ **Department of English**
1. Madhumita Majumdar
2. Safikul Islam
3. Abhijit Bhattacharjee

✱ **Department of Geography**
1. Debjani De
2. Ahish Biswas
3. Sujata Biswas
4. Probitra Mondal

✱ **Department of Commerce**
1. Subrata Goswami
2. Hemanta Mondal
3. Nobin Samanta

✱ **Department of Education**
1. Luna Kayal
2. Oindrilla Sengupta
3. Ismatara Yesmin
4. Barnali Dinda

✱ **Department of History**
1. Somnath Mandal
2. Soma Roy
3. Apurup Chakraborty

✱ **Department of Matchs**
1. Dr Shib Shankar Sana

✱ **Department of Philosophy**
1. Nanda Ghosh
2. Samima Yesmin

✱ **Department of Polical Science**
1. Malika Sen
2. Barnika Bandhopadhya
3. Debarati Das
4. Swapan Sarkar
5. Nizammudin Ahdmed

✱ **Department of Library**
1. Mosa Karim *(Library Asst.)*
2. Abdul Marup Molla *(Library Attendent.)*

Non Teaching Staff

1. **Abdur Rahim Baidya** *(Accountant)*
2. **Md. Kuddus Ali** *(Cashier)*
3. **Lalmia Molla** *(Clerk)*
4. **Tapash Kr. Debnath** *(Clerk)*
5. **Nityananda Monda** *(Typist)*
6. **Nazrul Islam Molla** *(Peon)*
7. **Bimal Kumar Naskar** *(Peon)*
8. **Kamala Rani Sardar** *(Lady Staff)*
9. **Khayer Ali Molla** *(Guard Stuff)*
10. **Rabeya Khatun** *(Sweeper)*

Contractual Staff

1. **Jahangir Siraj** *(Office Stuff)*
2. **Answar Ali Gazi** *(Electrician)*
3. **Jiban Sapui** *(Gym-Instructor)*
4. **Bhaskar Roy** *(Gardener)*

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদ

২০০৬-২০০৭ কমিটি সদস্য

ডঃ প্রদীপ কুমার বসু	☛	সভাপতি
রেবতী মণ্ডল	☛	সহঃ সভাপতি
রাকেশ রায়চৌধুরী	☛	সহঃ সভাপতি
আব্দুল মোমেন মোল্যা	☛	সম্পাদক
কাজল পাল	☛	সহঃ সম্পাদক
তাজনুভা পারভিন	☛	সহঃ সম্পাদক
আব্দুল মারুফ মোল্যা	☛	কোষাধ্যক্ষ
সুব্রত ঘোষাল	☛	পত্রিকা যুগ্ম সম্পাদক
আব্দুল হাকিম	☛	পত্রিকা যুগ্ম সম্পাদক
আসরাফুল আলম	☛	সমাজ কল্যাণ যুগ্ম সম্পাদক
রাজকুমার দে	☛	সমাজ কল্যাণ যুগ্ম সম্পাদক
মেজাম মোল্যা	☛	সদস্য
জাহাঙ্গীর সিরাজ	☛	সদস্য
ফরিদা পারভিন	☛	সদস্য
হাফিজা খাতুন	☛	সদস্য
সিন্টুকুমার পাল	☛	সদস্য
সুব্রত সামন্ত	☛	সদস্য
জিয়ারুল ইসলাম	☛	সদস্য
রবিউল ইসলাম	☛	সদস্য

STUDENT UNION 2005-2006

President	:	Dr. Pradip Kr. Basu
Vice President	:	Mohidul Islam Laskar
General Secretary	:	Moumita Acharya
Asst. General Secretary	:	Bazlur Rahaman Akunji
Cultural Secretary	:	Diganata Dutta
Literacy Secretary	:	Samim Ahmed Tarafder
Student Welfare Secretary	:	Abdul Kader Molla
Game Secretary	:	Laltu Karmakar
Member	:	Md. Samsuddin Ahamed
Member	:	Pinaki Mondal
Member	:	Nurul Islam Molla
Member	:	Bilkish Sultana
Member	:	Md. Hafijul Islam
Member	:	Partha Sarkar
Member	:	Akramul Hossain Mondal
Member	:	Sekh Kamirul Islam
Member	:	Gautam Chowdhury
Member	:	Aparajita Chakraborty
Member	:	Probir Kumar Ghosh
Member	:	Khairul Islam Gazi
Member	:	Anirban Das
Member	:	Mehebub Alam
Member	:	Mainur Rahaman Tarafder
Member	:	Swapan Sardar
Member	:	Utpal Mondal
Member	:	Mohiuddin Molla
Member	:	Sanjura Khatun
Member	:	Amina Khatun
Member	:	Md. Hasemali Baidya
Member	:	Mir Ariful Islam
Member	:	Pradyut Pal
Member	:	Yead Ali
Member	:	Bakul Gole
Member	:	Md. Moniruzzaman Gazi
Member	:	Arju Hossain